TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

রেল ক্যানভাস

বিশেষ আকর্ষণ

সত্যজিৎ ১০০

ছোট রেলের ইতিকথা

বর্ধমান - কাটোয়া ছোট লাইনের ইতিবৃত্ত

সম্পাদকের কলম থেকে...

১৯৭৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমসে একটি প্রতিবেদনের শীর্ষক ছিল 'Satyajit Ray Finds A Freedom in Films'। সেই সাক্ষাৎকারে শ্রী রায় বলেছিলেন যে ছবি করার মধ্যেই তিনি স্বাধীনতার রসদ খুঁজে পান। তিনি নিজেই চিত্রনাট্য লেখেন, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নির্বাচন করেন, গান লেখেন, সঙ্গীত পরিচালনা করেন, সম্পাদনা করেন অর্থাৎ ফিল্ম শুটিংএর আদ্যপান্ত সবটাই তাঁর করায়ত্ত। এবং এর সুবাদেই তিনি অপার স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাঁর কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ঘটাতে যেটা নাকি ভীষণ ভাবে সাহায্য করে এসেছে। এই প্রতিবেদনের প্রায় পাঁচ দশক অতিক্রান্ত হবার পরও এই ভাবনা আম বাঙালির কাছে ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের কাছে ছবি করতে পারাই ছিল তাঁর মানসিক স্বাধীনতার মাধ্যম। একই ভাবে গোটা বিশ্বজুড়ে অতিমারী কবলিত এই অস্থির সময়, তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ ভক্তদের কাছে তাঁর লেখা গল্প, তাঁর সিনেমা, তাঁর লেখা গান, তাঁর সৃষ্ট আবহসঙ্গীত, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য, এই সবই যেন একপ্রকার মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও অবকাশের মাধ্যম। দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে, সময়ের অধীনে নিমজ্জিত হয়ে কাজের ফাঁকে, শ্রী রায়ের প্রতিটি সৃষ্টি যেন এক ঝলক স্বাধীনতার আস্বাদ। আমাদের মত রেলপ্রেমীদেরও প্রেরণার অন্যতম উৎস মূলত পর্দায় তাঁর সৃষ্টি। তাঁর বিভিন্ন ছবিতে যেভাবে রেলকে নানান আঙ্গিকে উপস্থাপনা করেছেন, তাতে আমরা উৎসাহিত বোধ করেছি। তাঁর শততম জন্মবার্ষিকীতে রেল ক্যানভাস পরিবারের তরফ থেকে রইলো একটি বিনম্র নিবেদন ' সত্যজিতের ক্যামেরায় রেল '।

গত শতাব্দীর গোড়ার থেকেই বাংলার বুকে রেলের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটতে দেখা গেছে। পূর্ব ভারতীয় রেল কোম্পানির হাত ধরে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর সাথে দেশের বাকি প্রান্তের যোগাযোগের উন্নতি ঘটে। কিন্তু কলকাতা সঙ্গে মূলত দক্ষিণের জেলাগুলির যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্রডগেজের সাথে সাথে বিভিন্ন কোম্পানি পরিচালিত ছোট রেলের অবদান অনস্বীকার্য। বাগুইহাটি থেকে বসিরহাট, কালীঘাট থেকে ফলতা, শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপঘাট, হাওড়া থেকে আমতা, কাটোয়া থেকে বর্ধমান সর্বত্রই ছিল ছোটো রেলের আধিপত্য। মার্টিনের রেল, ম্যাকলিয়ড কোম্পানির রেল ইত্যাদি যা একসময় দাপিয়ে বেড়িয়েছে বাংলার বুকে, কালের প্রভাবে আজ তার সবই অতীতের স্মৃতি মাত্র। সেরকমই এক ছোট রেলের পথচলার বিবরণ নিয়ে এসেছেন শ্রী অর্কোপল সরকার। এই সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীর রূপে, তাঁর প্রতিবেদন ছোট রেলের ইতিবৃত্ত।

ভারতের প্রথম এবং কলকাতার গর্বের পাতাল রেল তথা মেট্রোর জন্মলগ্নের কিছু টুকরো স্মৃতিচারন করেছেন রিটায়ার্ড জজ এবং একজন আদ্যন্ত রেলপ্রেমী শ্রীযুক্ত সৌমিত্র পাল।

তাঁর বহু বছরের কর্মজীবনে বহু উচ্চপদের গুরুদায়িত্ব অক্লেশে সামলেছেন এবং এখনও সামলে চলেছেন। দায়িত্বের রোজনামচার সাথে সাথে তিনি ভারতীয় রেলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার অন্যতম মূল কান্ডারী। ভারতীয় রেলকে এক মহীরূহ বলা যেতে পারে, যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস। সেই বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শনকে স্বমহিমায় পুনঃস্থাপিত করার দুরূহ কাজটি তিনি সেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বর্তমানে রেলের হেরিটেজ কমিশন যে সব লোকোমোটিভ, স্টেশন, এবং রেলের পুরাকালের নানান আনুষঙ্গিক জিনিস কে সংরক্ষণ করার কাজ করে চলেছে তার কৃতিত্ব অনেকাংশে এই মানুষটির ওপরেই বর্তায়। এতসবের মাঝে থেকেও যে জিনিসটিকে তিনি উপেক্ষা করেননি, তা হল তাঁর শিল্পীসত্বা। ভারতীয় রেলের ইতিহাস ঘেঁটে বেশ কিছু অমূল্য তথ্য তিনি একত্রিত করেছেন বহুদিন ধরে। এবং পরবর্তী কালে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আশ্চর্য্য সাবলীল ভাষায়। তিনি, শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র, বর্তমানে দক্ষিণ পশ্চিম রেলের অতিরিক্ত মহাকর্মধক্ষ হিসেবে কর্মরত। তাঁর এরকম নানাবিধ লেখনীর মধ্যে থেকে মাত্র তিনটিকে আমরা এই সংখ্যায় একত্রিত করতে পেরেছি। ১৮ শতকের দুর্ধর্ষ রেল ডাকাতির উপাখ্যান হোক, বা বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) মেলের সূচনাকালে সফরকারী অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতা অথবা আবার পূর্ব ভারতীয় রেলের জন্মলগ্নের কথা, সমস্ত রচনাতেই লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যাবসায়ের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। কারণ প্রায় ১৫০ বছর আগেকার ঘটনাবলীর তত্ব তালাশ করে, সঠিক তথ্য অনুযায়ী সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করার কাজটি যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। তাঁর এই সাধনাকে রেল ক্যানভাসের পক্ষ থেকে কুর্নিশ জানানো হচ্ছে। এবং আমরা গর্বিত তাঁর সাহিত্যকীর্তি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য।

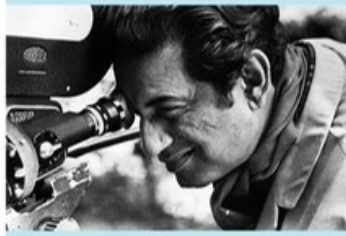

সত্যজিৎ ১০০

রেল ক্যানভাস

এটি একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উৎপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যের e-পত্রিকা সংস্করণ। এই e-পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে TrainTrackers -এর নিজস্ব সৃষ্টি এবং স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত। এই সংস্করণ অথবা e-পত্রিকা সম্বন্ধিত কোনো প্রকার জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন – railcanvaz@gmail.com

TRAINTRACKERS
প্রকাশক

কৌস্তভ চৌধুরী
মুখ্য সম্পাদক

অর্কোপল সরকার
যুগ্ম সম্পাদক

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী
গ্রন্থন, পরিকল্পনা ও সংকলন

অনমিত্র বোস
সহকারী সম্পাদক

শ্রেয়া চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক

Team TRAINTRACKERS

সোমশুভ্র দাস
অধ্যক্ষ

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

অঞ্জন রায় চৌধুরী
যুগ্ম সম্পাদক

শুভদ্যুতি বোস
কোষাধ্যক্ষ

অর্কোপল সরকার
জনসংযোগ

অনমিত্র বোস, কৌস্তভ চৌধুরী
সদস্যবৃন্দ

© TrainTrackers. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই e-পত্রিকার সমস্ত বিষয়বস্তু অর্থাৎ রচনা, ছবি, প্রবন্ধ, কাহিনী, নকশা, শিল্পকলা -র সমস্তকিছু স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত। কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, এইসবের কোনো প্রকার প্রতিলিপি, অনুলিপি বা পুনরুৎপাদন কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই e-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত (গুলি) সম্পূর্ণ ভাবে লেখকদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। তা কোনোভাবেই TrainTrackers -এর এবং ভারতীয় রেলের সরকারি নীতি বা মতামত বা দর্শন হিসেবে গণ্য করা যাবে না। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই, প্রদানকারী লেখক, চিত্রগ্রাহক বা তথ্যপ্রদানকারি ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে এই e-পত্রিকার বিষয়বস্তু একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে TrainTrackers সেই প্রদানকারীদের মতামতের সঙ্গে কোনো প্রকারে সহমত পোষণ করে বা ভবিষ্যতে করবে। এবং এই প্রসঙ্গে এও জানানো হচ্ছে যে এই e-পত্রিকায় প্রদানকারী বিষয়বস্তুগুলির যথাযোগ্যতা, সম্পূর্ণতা ও মূল্যায়নের দায়ভার TrainTrackers –এর ওপর কোনোভাবেই বর্তায় না। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রদানকারীদের বিবেচ্য।

ভারতীয় রেলে কর্মরত অবস্থায় তাঁর আট বছর অতিক্রান্ত। দৈনন্দিন কর্মজীবনে, কাজের ফাঁকে তাঁর মূল শখও কিন্তু দিনের শেষে সেই রেলই। কর্মসূত্রে বহু ক্ষুদ্র অথচ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছেন এবং সময় সময় তা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ডাইরির পাতায়। যা আমরা ধারাবাহিক ভাবে 'রেলপ্রেমীর ডাইরি থেকে' নামে প্রকাশ করে চলেছি। আগের সংখ্যায় মূলত তাঁর রেলপ্রেমী হয়ে ওঠার গল্প শুনেছিলাম। এবার শ্রী বিপ্লব দেবনাথের ঝুলিতে আন্তর্জাতিক ট্রেন বন্ধন এক্সপ্রেসের বিভিন্ন কাহিনী।

বাস্তবিক ভাবে দেখলে আজকালকার যুগের মূল মন্ত্রই হলো গতি। হাতের মুঠোয় থাকা ফোনের নেট সংযোগ হোক বা পরিবহনের মাধ্যম হোক সর্বত্রই মানুষের চাই গতি। তাদের হাতে সময়ের বড়ো অভাব। কর্মস্থল হোক বা বাড়ি সবাই চায় যেতে তাড়াতাড়ি। এই গতির দৌড়ে টিকে থাকতে হলে খোলনলচে বদলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অত্যন্ত জরুরী। সেটা সঠিক ভাবে না পারলে যে দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তা আমাদের প্রিয় কলকাতার ট্রামকে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। শতাব্দীপ্রাচীন, পরিবেশবান্ধব ট্রাম কলকাতার ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সারা বিশ্বে, শহর কলকাতার তিনটি অতি পরিচিত প্রতীকের মধ্যে অন্যতম এই ট্রাম বিগত পাঁচ দশক ধরে সরকারি অবহেলার শিকার। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ট্রামের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ একে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কলকাতার ট্রামের সেই উত্থান-পতনের কাহিনী, গল্পের ছলে ব্যক্ত করেছেন রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।

দার্জিলিং এর হাতছানি এড়াতে পারবে এরকম মানুষের দেখা মেলা ভার। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শৈলশহরের সৌন্দর্য নিয়ে কোনও কথাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। তুষারময় শৃঙ্গ থেকে সবুজ পাহাড়ের প্রশান্তি, এ এক সুন্দরের সাম্রাজ্য। এর সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য অঢেল। লাল রডোডেনড্রন, সাদা ম্যাগনোলিয়া, পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে সবুজ চা গাছের বাহার, বনাঞ্চল, ঘরের মাঝে হানা দেয় মেঘের দল-- সব মিলিয়ে দার্জিলিং-কে পাহাড়ের রানি করে তুলেছে। ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা এই রানির মাথার মুকুট। তাই আজও এই শৈলশহর তার রাজকীয়তা নিয়ে স্বমহিমায়। দার্জিলিং'এর আরেক দুর্নিবার আকর্ষণ হলো তার শতাব্দি প্রাচীন টয় ট্রেন। বাচ্চা থেকে বুড়ো বার বার ছুটে এসেছে এর প্রলোভনে। একই আকর্ষণে, রেলপ্রেমী না হয়েও তাঁর প্রথম টয় ট্রেনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে কলম ধরেছেন শ্রীমতী শ্রেয়া চক্রবর্তী।

বস্তুত বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই ভারতীয় রেলে 3-phase প্রযুক্তি অবলম্বনে ট্রেন চালানোর ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। ফলস্বরূপ প্রথমে বেশ কিছু মালবাহী এবং কিছু যাত্রীবাহী 3-phase প্রযুক্তির লোকোমোটিভ আমদানি করে আনা হয়। এই কর্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করার ফলে নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে ভারতীয় রেলে নবপ্রযুক্তির উন্মেষ ঘটে। এবং এই 3-phase প্রযুক্তি অবলম্বনেই ভারতে লোকোমোটিভ তৈরী হতে থাকে। পরবর্তীকালে একই প্রযুক্তির ব্যবহার, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী লোকাল ট্রেন বা EMU এবং মেট্রো রেলেও দেখতে পেতে থাকি। এবং 3-phase প্রযুক্তিতে বলীয়ান EMU ট্রেনের অন্দরমহলের হদিশ দিয়েছেন শ্রীমান অনমিত্র বোস, তাঁর সহজ ও সাবলীল ভাষায়।

অতিমারীর উপর্যুপরি আক্রমণে আজ মানবসভ্যতা দিশাহারা। উন্নয়ন ও সভ্যতার অগ্রগতির ধুয়ো তুলে তার ওপর নির্মম অত্যাচারের বদলা নিতে প্রকৃতি আজ বদ্ধপরিকর। একটি অতি প্রাসঙ্গিক কথা আছে - ইতিহাস থেকে আমরা এটাই শিখেছি যে ইতিহাস থেকে আমরা কখনো শিক্ষা নেইনি। হয়তো এই অতিমারীর ঢেউ আমরা কোনক্রমে সামাল দেব। বহু পরিচিতদের চিরতরে হারাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি ধ্বংস করা থেকে পিছিয়ে আসব না। বরং যারা রক্ষা করতে ইচ্ছুক তাদের বাধা দেব নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু তবুও এ পথ চলা থামার নয়। অতিমারী কবলিত হয়ে যে বিশ্ববরেণ্য মানুষটির শততম জন্মদিনটি ঘরবন্দি হয়েই কাটাতে হলো, তাঁর লেখা একটি ছবির সংলাপ আজ অতি প্রাসঙ্গিক – যতক্ষণ 'শ্বাস' ততক্ষন আশ। এই 'আশ' কে সঙ্গী করেই এই দুঃসময়ে, ঘরবন্দি অগণিত রেলপ্রেমীদের মুখে হাসি ফোটাতে, ফের হাজির হয়েছে রেল ক্যানভাস।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই সেই সব মানুষকে, যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বলীয়ান হয়ে আমরা আবার সচেষ্ট হয়েছি এই সংখ্যা প্রকাশ করতে। ধন্যবাদ প্রাপ্য সেই সকল লেখক লেখিকাদের যাঁদের লেখনী ও চিত্র স্থান করে নিয়েছে এবারের সংখ্যার দু-মলাটের মধ্যে। ধন্যবাদ জানাই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে।

অতিমারি সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী পালন করুন। প্রয়োজন ছাড়া বেরনো আপাতত বন্ধ রাখুন। সুস্থ থাকুন ও সুস্থ রাখুন।

কৌস্তভ চৌধুরী
অর্কোপল সরকার

রেল ক্যানভাস

TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী

ছোট রেলের ইতিকথা

ছোটো রেল বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বেশ কয়েকটা নাম যার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হলেও স্মৃতির মণিকোঠায় তারা সজীব। এমনই একটি স্মৃতিচারণ ***অর্কোপল সরকারের*** ছোট রেলের গল্প, যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে বর্ধমান – কাটোয়া ছোট লাইনের ইতিবৃত্ত।

ভ্রমণ কাহিনী

বোম্বাই মেল

স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসা নানান ঘটনার সাক্ষী বোম্বাই মেল....কেমন ছিল সেই প্রারম্ভিক যাত্রা? তুলে ধরেছেন ***শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র*** যার যোগ্য অনুবাদ করেছেন রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।

সত্যজিৎ ১০০

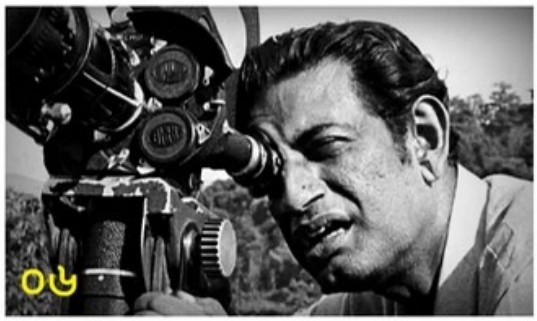

সত্যজিতের ক্যামেরায় রেল

সত্যজিৎ রায় ও তার অনবদ্য সৃষ্টির মাঝে সর্বদাই রেলের একটা পৃথক ভূমিকা রয়ে গেছে....তা সে পথের পাঁচালীর অপু-দুর্গার ট্রেন দেখার দৃশ্যের সারল্য হোক বা সোনার কেল্লার নানান অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলি হোক, সত্যজিতের ক্যামেরায় রেল প্রকৃতপক্ষে যেন এক অনন্য নায়ক....সত্যজিৎ রায়ের কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠা রেলের নানান দিক নিয়ে ***রুদ্রনীল রায় চৌধুরীর*** শ্রদ্ধার্ঘ এই নিবন্ধটি।

বিশেষ প্রতিবেদন

মেট্রো রেলের গোড়ার কথা

দেশের সর্বপ্রথম ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলের গোরাপত্তনের ও প্রাথমিক দিনের কিছু অমূল্য স্মৃতির ভাণ্ডার খুলেছেন ***শ্রীযুক্ত সৌমিত্র পাল।***

চিত্র কাহিনী

কু ঝিক্ ঝিক্

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ও তার রোমান্টিসিজমের বিবিধ রূপের মিষ্টি বর্ণনার সম্ভার কু ঝিক ঝিক - নেপথ্যে ***শ্রেয়া চক্রবর্তী।***

রেল ক্যানভাস

TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

রেলপ্রেমীর ডাইরি থেকে

কর্মসূত্রে ভারত-বাংলাদেশ সংযোগকারী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ট্রেন 'বন্ধন এক্সপ্রেস' এর সূচনা থেকে শুরু করে নানান বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন ***শ্রী বিপ্লব দেবনাথ***.....তার রেলপ্রেমীর ডায়েরি থেকে থাকছে লিপিবদ্ধ সেইসব কাহিনী।

জানা-অজানা

ডিজিটাল ভারতের 'মেধা'বী লোকাল

কালের প্রবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে প্রযুক্তির বিপ্লব যার ছোঁয়া লেগেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু পরিচিত সঙ্গী লোকাল ট্রেনের ওপরেও.....এমনই এক উন্নীত মানের প্রযুক্তির হদিশ উপস্থাপন করেছেন ***শ্রী জনমিত্র বোস।***

বিবিধ

৫৩ | জল ছবি
স্মৃতির সরণী বেয়ে...

ভিন্ন স্বাদের গল্প

জন্মলগ্নে পূর্ব রেল

পূর্ব ভারতীয় রেলের সূচনাকালের প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন ঘটনাক্রম এক সুতোয় বেঁধেছেন ***শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র।*** তাঁর এই অসামান্য লেখনীর ধারা বজায় রেখে প্রচ্ছদটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।

কলকাতার ট্রাম চরিত

কলকাতার ঐতিহ্য ট্রাম। তবে এই পরিবেশ বান্ধব যানবাহনটির প্রতি অবহেলার দীর্ঘ পাঁচ দশক ও বর্তমানের হাল-হকিকতের খতিয়ান গল্পচ্ছলে ব্যক্ত করেছেন ***রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।***

রেল ডাকাতির উপাখ্যান

ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে ও ১৫০ বছর পুরাতন তথ্য যাচাই করে, ১৮ দশকের রেল ডাকাতির উপাখ্যান তুলে ধরেছেন ***শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র*** যা এক সফল রূপ পেয়েছে রুদ্রনীল রায় চৌধুরীর অনুবাদের সুবাদে।

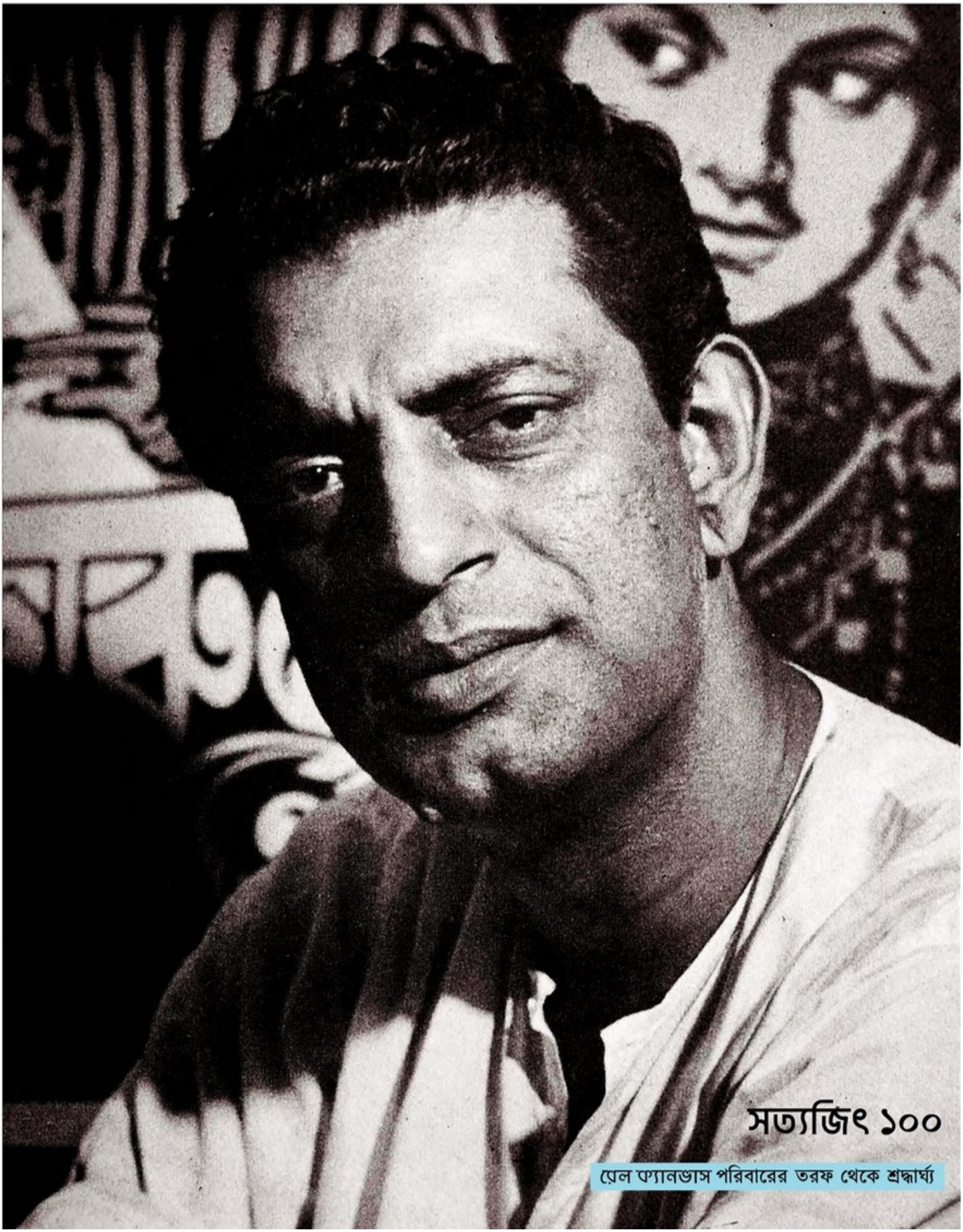
সত্যজিৎ ১০০
রেল ক্যানভাস পরিবারের তরফ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

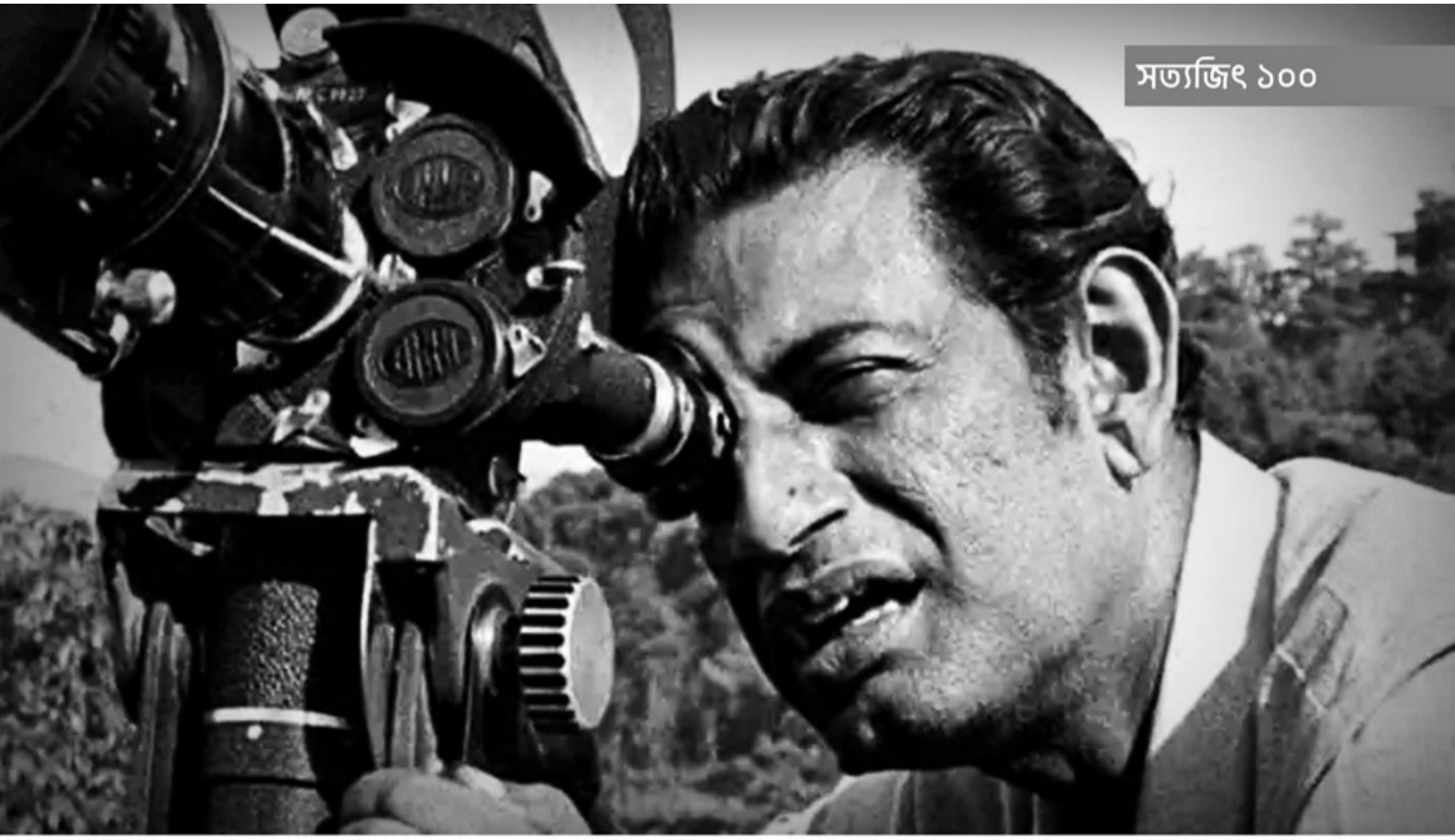

সত্যজিতের ক্যামেরায় রেল

- রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

"অপু সেরে উঠলে আমাকে রেলগাড়ী দেখাবি?"

এক ভাইয়ের কাছে তার দিদির শেষ আবদার। যা কখনো পূরণ হয়নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর এই দৃশ্যে মৃত্যুপথযাত্রী এক বালিকার শেষ ইচ্ছেটা ছিল রেলগাড়ী দেখা। আজকালকার বাস্তববাদী ও যন্ত্র সভ্যতার যুগেও আম বাঙালির কাছে কিছু জিনিস প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে। তা হল কিছু বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানদের অসামান্য সৃষ্টি। এঁদের কীর্তি কথায় ব্যক্ত করার দুঃসাহস বা সাধ্য কোনোটাই আমাদের নেই। বরং আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে এটুকুই জানাতে সচেষ্ট হয়েছি যে, এঁদের সৃষ্টি কিভাবে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে রেল সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলেছে। স্কুলের সিলেবাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম আঁটির ভেপু'র মধ্যে দিয়ে কৈশোরেই পথের পাঁচালীর আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। বাছুর খোঁজার অছিলায় কাশবনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে বালক অপু ও দুর্গার প্রথম রেললাইন দেখার উপাখ্যান মনকে দোলা দিয়েছিল। রেলের প্রতি বাচ্চা-বুড়োর এই অদ্ভুত কৌতুহলকে লেখক উপেক্ষা করতে পারেন নি। অপু দুর্গার প্রথম রেললাইন দেখার সেই বিবরণ বহু বাঙালীর কাছেই তাদের কেমন যেন নিজের কাহিনীর মত।

বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ও তাঁর প্রথম ছবিতে এই কৌতুহলকে জায়গা দিয়েছিলেন এবং রেলের প্রতি তাঁর নিজের আগ্রহও পরবর্তী কালে তার বেশ কিছু কাজে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সেই কাজকে আমাদের রেলপ্রেমী হওয়ার প্রেরণা বললেও এতটুকু অত্যুক্তি হবে না। এটা অবশ্য বলা বাহুল্য যে তাঁর চলচ্চিত্রে রেল কেবলমাত্র একটা পরিবহন মাধ্যম হিসেবে জায়গা পেতো না বরং কাহিনীর কোনো ভাগের বা ক্ষেত্রবিশেষে গোটা কাহিনীর প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু তাঁর কাহিনীতে রেলের ভূমিকাটা ঠিক কি সেটা নির্ধারণ করার ভার তিনি মূলতঃ দর্শকদের ওপরেই ছেড়েছেন। তাই তাঁর ছবিতে রেলগাড়ির দৃশ্য আট থেকে আশি সকল বয়সের কাছে সমান আগ্রহের এবং চিত্তাকর্ষক। যেমন পথের পাঁচালীতে দুর্গা-অপু যখন কাশবনের ভেতর দিয়ে বাছুর খুঁজতে খুঁজতে তাদের জগতের গণ্ডির শেষ প্রান্তে রেল লাইনের ধারে এসে পড়ে। তার কিছু পরেই তাদের কানে আসে রেলের চাকার আর ইঞ্জিনের ধোয়া ছাড়ার শব্দ। প্রথমবার রেলগাড়ী দেখে দুজনের চোখে অবাক বিস্ময়, নির্মল আনন্দ এবং কৈশোরের সরলতা এই দৃশ্যটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। গল্পের এই জায়গাতে সত্যজিৎ উপন্যাস থেকে সরে এসেছেন। অপু-দুর্গার সামনে রেলগাড়িকে হাজির করিয়েছেন যা উপন্যাসে ছিলনা। এবং একই সঙ্গে তিনি রেলের দৃশ্যের পরে পরেই ইন্দির ঠাকরুনের শেষ সময় অত্যন্ত সুচারু ভাবে উপস্থাপন করলেন। লেখক লিখেছিলেন, "ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেলো"। সিনেমায় সত্যজিৎ দেখালেন যে সেকালের যুগের অবসান ঘটার সাথে অপু-দুর্গার সামনে দিয়ে আধুনিক যুগের দূত হিসেবে রেলগাড়ির আবির্ভাব হয়। এতো সুন্দর ভাবে রেলকে প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরার কাজ বোধহয় ওনাকে ছাড়া সম্ভব ছিল না। দুর্গার শেষ ইচ্ছে অপু পূরণ করতে পারেনি। উপন্যাসে লেখক অপুর মনের কথা বলেছেন, যখন সে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার সময় প্রথমবার রেলগাড়ী চাপলো। আনন্দ ছিল, উত্তেজনা ছিল কিন্তু কিছু যেন ছিলনা, কেউ যেন ছিলনা। ট্রেন ছাড়ার সাথে সাথেই অপু যেন দুর্গার অভিমান ভরা মুখটা দেখতে পায়। মাঝেরপাড়া দিস্টান্ট সিগনালটা আবছা হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে যায়।

সত্যজিৎ কিন্তু পথের পাঁচালি ছবিতে এই দৃশ্য দেখালেন না। একই দৃশ্য অন্য আঙ্গিকে ফুটে উঠলো তাঁর পরের ছবি 'অপরাজিত'তে। হরিহরের মৃত্যুর পর, সর্বজয়া অপুকে নিয়ে কাশী ছেড়ে তার দাদার বাড়ি মনসাপোতা গ্রামে থাকতে যায়। সেই রেল সফরের দৃশ্যেও কোনো সংলাপ নেই। আছে শুধু চোখের ভাষা। মনসাপোতা গ্রামে, বাড়ির দোরগোড়া

পথের পাঁচালীর কালজয়ী দৃশ্য

থেকে রেল দেখতে পেয়ে অপু তার মা কে উত্তেজিত ভাবে ডাকে। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে গলদ মনে হবে। যে ছেলে খানিক আগে রেলগাড়ি থেকেই নামল সে এরকম করবে কেন। কিন্তু এখানেই সত্যজিৎ রায়ের চমৎকারিতা। একই দৃশ্যে রেলের প্রতি কৈশোরের উন্মাদনা তার সাথে একটা যন্ত্রণা, না পাওয়ার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ির দরজা থেকে রেল দেখে অপুর ক্ষণিকের আনন্দ মিলিয়ে যায় কিছু একটার খোঁজে, কেউ যেন নেই, একটা যন্ত্রণা যেন গলা বেয়ে দলা পাকিয়ে ওঠে। একটা রেলগাড়ী যেন একই সাথে আনন্দ আর মন খারাপের বার্তা নিয়ে আসে। এইছবিরই আরেকটা দৃশ্যে সর্বজয়া দূরে রেললাইনের দিকে চেয়ে বসে থাকে ছেলের অপেক্ষায়। ট্রেন দেখলেই এক অপেক্ষারত মায়ের খুশি হয়ে ওঠা, রেল এখানে তাঁর সন্তানকে কাছে পাবার মাধ্যম। আবার পরবর্তী সময় সেই মা যখন মৃত্যুপথযাত্রী, রেলের শব্দ শুনেই অধির আগ্রহে তাঁর ছেলের আশায় বসে থাকে। এই রেল তার ছেলেকে তার কাছে নিয়ে আসবে কিনা জোনাকির জ্বলা-নেভার মধ্যে দিয়ে মনের মধ্যে সেই আশা-নিরাশার দোলাচল। কোনোরকম সংলাপহীন এই দৃশ্যগুলি চিরকালীন। সত্যজিৎ চিরকালীন। চিরকালীন কারণ বাস্তবেও একটি ট্রেন কারুর প্রিয়জনকে কাছে নিয়ে আসে আবার একই সাথে কাউকে দূরে নিয়ে যায়। কখনো চিরকালের মত।

ঠিক যেমন 'অপুর সংসারে' যখন সন্তানসম্ভবা স্ত্রী অপর্ণাকে পিতৃগৃহে পাঠানোর জন্য অপু তাকে ট্রেনে তুলে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারন একটি দৃশ্য। কিন্তু আসলে সেই তাদের মধ্যে শেষ দেখা। রেল এখানে অপর্ণার মৃত্যুর কারণ নয় কখনোই। কিন্তু সত্যজিৎ এখানে রেলকে চূড়ান্ত রোমান্টিসিজমের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছেদের শরিক করে দিয়েছেন।

অপরাজিত ছবিতে অপুর রেলগাড়ি দেখা

অপুর সংসার ছবিতে অপু আর অপর্ণার শেষ দেখা

এর তুলনা মেলা ভার। এই কাহিনীরই কিছুটা সময় সত্যজিৎ আবার রেলকে, প্রেক্ষাপট হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। চিৎপুর রেল ইয়ার্ডের মধ্যে, অপর্ণার থেকে পাওয়া শেষ চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হয়ে ওঠে অপু। কিন্তু কিছু পরেই স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ তাঁর সে আনন্দকে চিরতরে মুছে দেয়। সেই দৃশ্যেও বাড়ির ছাদ থেকে চিৎপুর রেল ইয়ার্ডকে পশ্চাদপট হিসেবে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ। খানিক পরেই, রেলের চাকার তলায় একটি বরাহের কাটা পড়ার দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে তিনি অপুর স্ত্রী বিয়োগের যন্ত্রণা কে তুলে ধরেছেন। এই কাহিনীর প্রতিটি দৃশ্যেই কিন্তু রেলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ আপাতদৃষ্টিতে সাধারন ভূমিকায় দেখানোর কাজটি নিঃশব্দে করেছেন সত্যজিৎ।

তাঁর আরো একটি ছবি, 'মহাপুরুষ'এ রেলসফরের মজার দিকটিও তিনি তুলে ধরেন। বিরিঞ্চিবাবার মত এক ভন্ড সাধুর মুখে মজার মজার সংলাপ এই কাহিনীর মূল সুর। পরশুরামের কাহিনীর ঝকঝকে এক চিত্ররূপের মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ মজাচ্ছলে তুলে ধরেন প্রবহমান সমাজের চিরন্তন মানসিকতার একটা দিক, তাঁর এই ছবিতে। বিরিঞ্চিবাবার রেল ভ্রমণের সময় তার সহযাত্রীদের সঙ্গে অদ্ভুত মজার কথোপকথন, সত্যজিতের ক্যামেরায় হাস্যরসের মাধ্যমে অন্যমাত্রা পেয়েছে। নিপুণ দক্ষতায় তিনি বিরিঞ্চিবাবার মত ভন্ড সন্ন্যাসীর বিশেষত্ব বর্ণন এবং চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। বাস্তবেও আমরা রেল ভ্রমণের ফাঁকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্পর্শে আসি। সেই ক্ষনিকের আলাপ কখনো মজার বা সুখের হয় আবার কখনো তা বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু এইসব বহুত্বের মধ্যে দিয়েই রেলযাত্রা

অপুর সংসার ছবিতে চিৎপুর রেল ইয়ার্ড, পেছনে টালা জলাধার

মহাপুরুষ ছবিতে বিরিঞ্চিবাবার রেলযাত্রা - সিমুলতলা স্টেশন

চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এই কারনেই তো রেলসফর কখনোই একঘেয়ে হয় না।

এরপরে তাঁর আরো একটি অদ্ভুত সুন্দর ছবি নায়ক। রেল এখানে গোটা কাহিনীর প্রেক্ষাপট। ভারতের প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত vestibule express এর আদলে পুরো সেটটা সত্যজিৎ বানাতে বলেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহকর্মী, দিকপাল শিল্প-নির্দেশক শ্রী বংশী চন্দ্র গুপ্তকে। পূর্ব রেলের লিলুয়া ওয়ার্কশপ থেকে বংশী সেই ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস এবং রেস্তোরাঁ কোচের নকশা জোগাড় করেন এবং তারপরের ব্যাপার ছবিতেই দেখা গেছে। অসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল সেই 'ট্রেনের কামরা'। সঙ্গে দুলুনি যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই দুলুনি নিয়ে নাকি বেশ মজার একটা ঘটনা ছিল যেটা শোনা যায়। সত্যজিৎ চেয়েছিলেন যে গোটা সেটটা যাতে নড়ানো যায় সেরকম ব্যবস্থা করতে যাতে ট্রেনের স্বাভাবিক দুলুনি বোঝা যায়। প্রথমে ঠিক ছিল যে গোটা সেট টায়ারের ওপর রাখা থাকবে কিন্তু টায়ারগুলোর পক্ষে সেটের ভার বহন সম্ভব ছিল না। এদিকে বংশী দেখলেন যে সেট এতো বেশি ভারী হয়ে গেছে নড়ানোই যাচ্ছে না। এরপর সত্যজিতের মাথা থেকে বেরোলো এক অদ্ভুত আইডিয়া। তিনি জানলার বাইরের দৃশ্য দেখানোর স্ক্রিনটাকেই নাড়াতে বললেন। এতে একটা বিভ্রম তৈরি করা হলো এবং ক্যামেরায় মনে হলো যে ট্রেন সত্যিই নড়ছে। এছাড়াও এই ট্রেনের শব্দ একদম খাঁটি মনে হবার কারণ সত্যজিৎ নিজে vestibule এ দাঁড়িয়ে সাউন্ড রেকর্ড করতে করতে দিল্লি গিয়েছিলেন শুটিং এর আগে। যাইহোক, শুরুর কথায় ফিরে আসা যাক যে, এই ছবিতে রেল একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। সত্যজিৎ এখানে রেলভ্রমণের ফাঁকে একজন নায়ককে শিল্পসত্তার মধ্যে থেকে তাঁর ভেতরের অন্য মানুষটাকে বাইরে এনে ফেলেছেন। রেল এখানে যেন জীবনের প্রবহমান গতির বার্তাবাহক। সে গণ্ডির বাইরে

নায়ক ছবিতে ডাইনিং কার বা রেস্তোরাঁ কোচের সেট

নিয়ে গিয়ে মানুষকে নতুন পৃথিবী চিনতে বা জানতে শেখায়। ঠিক তেমনই, একজন সাংবাদিক যে 'নায়ক'কে শুধুমাত্র একজন অভিনেতা হিসেবেই জেনে এসেছে এবং নানান ভুল ধারণা তাঁর সম্বন্ধে পোষণ করে এসেছে, সে এই যাত্রাপথের মধ্যে দিয়ে 'নায়ক'কে নতুন ভাবে জানতে ও চিনতে পারে। বহু ভুল ধারণাই একজন স্টারকে কেন্দ্র করে জনমানসে তৈরি হয়, এই ছবিতে সেটা ভেঙে দেবার কাজ করে এই রেলযাত্রা। রেলকে এতো সুন্দর করে জীবনস্রোতের সাথে মিলিয়ে ছবিতে ফুটিয়ে তোলার জন্য সত্যজিৎ রায়কে শতকোটি প্রণাম।

এই ছবির পর, সত্যজিৎ রায় আবার রেলকে প্রাধান্য দিলেন 'সোনার কেল্লা' ছবিটি করার সময়। তৈরি হলো ভারতীয় চলচিত্রের ইতিহাসে রেলকে নিয়ে তোলা সবথেকে অবিস্মরণীয় শট। ঢেউ খেলানো মরুপ্রদেশে, আদিগন্ত বিস্তৃত বালির মধ্যে উটে সওয়ার বাঙালির সর্বকালের প্রিয় জুটি ফেলুদা, জটায়ু ও তোপসে, আর কালো ধোঁয়ার সাথে আগুয়ান মিটারগেজ কয়লার ইঞ্জিনের ট্রেন। সাথে সত্যজিতের নিজস্ব আবহসঙ্গীতের যাদু। এই দৃশ্য যেন চিরকালীন। বাচ্চা থেকে বুড়ো, আট থেকে আশি এই দৃশ্য যেন সবার ভালো লাগার। এই দৃশ্য ছাড়া এই ছবি যেন ভাবাই যায় না। এই ছবিতে রেলকে আবার অজানাকে জানার, নতুনের সান্নিধ্য পাওয়ার মাধ্যম হিসেবেও তুলে ধরলেন শ্রী রায়। ফেলুদার গল্পের অবিচ্ছেদ্য চরিত্র প্রখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক শ্রী লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর আবির্ভাব রেলের কামরাতেই ঘটে। আবির্ভাবেই জটায়ুর সংলাপের দৃশ্য দর্শকের মনে আজীবন গেঁথে থাকবে। উটের পিঠে চড়ে ফেলুদার ট্রেন থামানোর

নায়ক ছবিতে প্রথম শ্রেণীর কামরার সেট

প্রথম শ্রেণীর কামরায় জটায়ুর আবির্ভাব - সোনার কেল্লার ছবিতে

সোনার কেল্লার সেই বিশ্বখ্যাত দৃশ্য

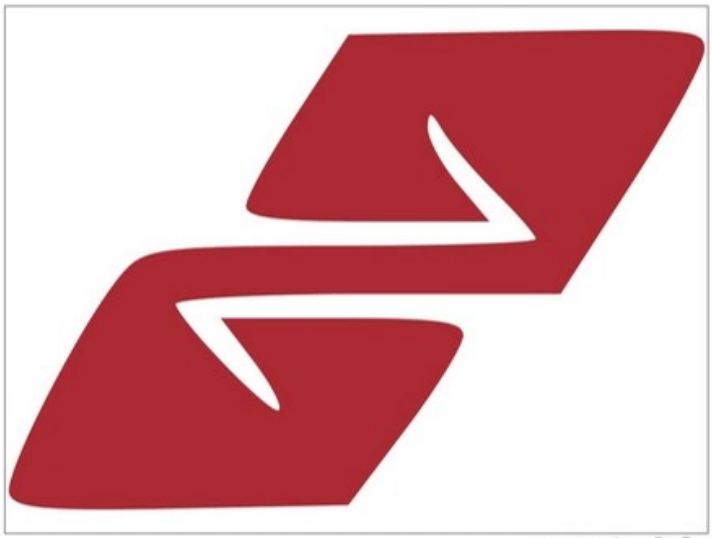
কলকাতা মেট্রোর প্রতীক চিহ্ন

দৃশ্যের কথা আগেই বলা আছে। এরপর রাতের রামদেওড়া স্টেশনের দৃশ্যে ফের ট্রেন ফিরে আসে। নির্জন মরুভূমির বুকে নির্বান্ধব, জনহীন একটি স্টেশনে রাতদুপুরে একটা টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে ট্রেন আসার দৃশ্য যেকোনো রেলপ্রেমীর গায়ে কাঁটা দেওয়ায়। তারপর মিটারগেজের কামরার মধ্যে ট্রেন ছাড়ার পরের রোমহর্ষক ঘটনা, মন্দার বোসের চলন্ত ট্রেনের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় লাফানো (যদিও এই অংশটি স্টুডিওতে শুট করা হয়েছিল, নায়ক'এ ব্যবহৃত ট্রেনের সেট দিয়ে) ইত্যাদি এক কথায় অসাধারণ। এর চেয়ে রোমাঞ্চকর রেলযাত্রার কথা ভাবা যায়না। আবার তার পরদিন সকালে ট্রেন থেকেই ফেলুদা ও তোপসে দেখতে পায় পাহাড়ের মাথায়, সূর্যের আলোয় ঝলমল করা সোনার কেল্লা ওরফে জয়সলমির ফোর্ট। বাঙালির পর্যটনের দিশাই পাল্টে দেয় এই দৃশ্য। শুটিংয়ের পরে ওখানের স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য ছিল, যে আগে ওখানে ওই প্রত্যন্ত জায়গায় পর্যটন বলতে শুধু কিছু সাহেবের আনাগোনা ছিল কিন্তু একবার এক বাঙালি পরিচালক এসে এখানে শুটিং করে সিনেমা বানালেন এবং তারপর যেন পর্যটনে ঢেউ উঠলো। বহুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে রাজস্থানের এই শহর। বিশেষত বাঙালির কাছে। কিন্তু রেল না থাকলে এই জিনিস হতো বলে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও মনে করতেন না। ফেলুদার উটে চড়ে ট্রেন থামানোর দৃশ্যের শুটিং এর সময়ের কিছু মজাদার ঘটনা শ্রী রায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যার থেকে জানা যায় যে এই দৃশ্য তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। কয়লার দাম বেড়ে যাবার কারণে রেল কোম্পানি নাকি বিনা নোটিশে শুটিংয়ে দেবার ট্রেনটি বাতিল করে দেয়। নাছোড়বান্দা সত্যজিৎ রেলকর্তাদের সাথে দেখা করে বেশি দামে কয়লা কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফের শুটিংয়ের জন্য ট্রেনের ছাড়পত্র জোগাড় করেন। প্রথমবার শুটিংয়ের দিন ট্রেন আড়াই ঘন্টা দেরীতে এসে পৌঁছয়। সেদিন আলো কমে আসার দরুন কামরার ভেতরের কিছু শুটিং করেই ক্ষান্ত দিতে হয়। পরদিন অবশ্য যথাসময় ট্রেন আসে। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধে শুটিংয়ের সময়। দৃশ্যে আছে যে ফেলুদা রুমাল নেড়ে ট্রেন থামাতে ইশারা করবে কিন্তু ট্রেন তার স্বাভাবিক গতিতে, ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে চলে যাবে। শুটিংয়ের সময় ফেলুদার ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের রুমাল নাড়া দেখে লোকো পাইলট ট্রেন থামিয়ে দেন। স্বভাবতই তিনি বুঝতে পারেন নি যে তাঁর কোনো ভাবেই ট্রেন থামানোর কথা নয়। দ্বিতীয়বারের শটও বাতিল হলো কারণ সব ঠিক থাকলেও ট্রেনের ধোঁয়া বেরোচ্ছিল না। কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া এই শট অসম্ভব ছিল। এর কারণ জানা গেলো যে, যিনি স্টোকার ছিলেন মানে কয়লা খামচা দিয়ে তুলে বয়লারের মধ্যে দেওয়া যার কাজ তিনিই শুটিং দেখতে ব্যস্ত হয়ে গেছিলেন। তৃতীয়বার সব ঠিক ভাবে উৎরে যায়। সত্যজিৎ রায় নিজেই পরে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে এই দৃশ্য ছাড়া সোনার কেল্লা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। সত্যিই তাই। ভারতীয় চলচ্চিত্রে রেলকেন্দ্রীক ছবি কমই আছে। তাই এই বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর, রেলকে কেন্দ্র করে তাঁর অসাধারণ সব কীর্তিকে কুর্নিশ না জানিয়ে থাকা যায় না। এইসব দৃশ্য এতো প্রাঞ্জল করে উনি না দেখালে, রেলের প্রতি আজন্ম কৌতূহলের সাথে আগ্রহ ও রোমান্টিসিজমের মিশেল এক অদ্ভুত ভালোলাগা হয়তো তৈরি হতো না। তাঁর শততম জন্মবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।

পরিশেষে জানানো যেতে পারে যে সত্যজিৎ রায় যে তাঁর বিভিন্ন ছবিতে রেলকে শুধু ক্যামেরাবন্দি করেছেন তাই নয়, বরং তাঁর নাম তৎকালীন ভারতীয় রেলের আধুনিকতার নিদর্শন 'কলকাতা মেট্রোর' সাথেও অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ এই বিশ্ববরেণ্য বাঙালীর হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের প্রথম মেট্রো রেলের প্রতীক চিহ্ন বা লোগোটি। ইদানীংকালে এই নিয়ে বিশেষ চর্চা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা সত্যি যে বিগত কিছু বছর ধরেই এই লোগোটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে লোপাট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমানে ট্রেনের গায়ে ভারতীয় রেলের প্রতীকটি জ্বলজ্বল করলেও মেট্রোর নিজস্ব প্রতীকটির দেখা শুধুমাত্র স্টেশন বোর্ড, বা ইলেক্ট্রনিক বোর্ডগুলিতে কদাচিৎ দেখা মেলে। এবং লজ্জাকর ব্যাপার এই যে এই নিয়ে আম বাঙালীর কোন হেলদোল দেখা যায় নি। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে নিশ্চিত ভাবেই আছেন কিছু স্বার্থান্বেষী অবিবেচক, আর তাতে হাততালি দেওয়ার জন্য বিশাল সংখ্যক উন্মাদদের উদ্দেশ্যই হয়তো কবির উক্তি ছিল '.... রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।' সত্যজিৎ জন্মশতবর্ষে এই উপেক্ষা নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য নয়। কাজেই সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে তাঁর অনবদ্য ভাষাতেই বলা যেতে পারে,

'ও মন্ত্রিমশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই, থেমে থাক।'

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: শ্রী সন্দীপ রায়।
তথ্য সমৃহ: একেই বলে শুটিং গ্রন্থ, সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র।
প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি বহুল প্রচলিত এবং ইন্টারনেট থেকে গৃহীত।

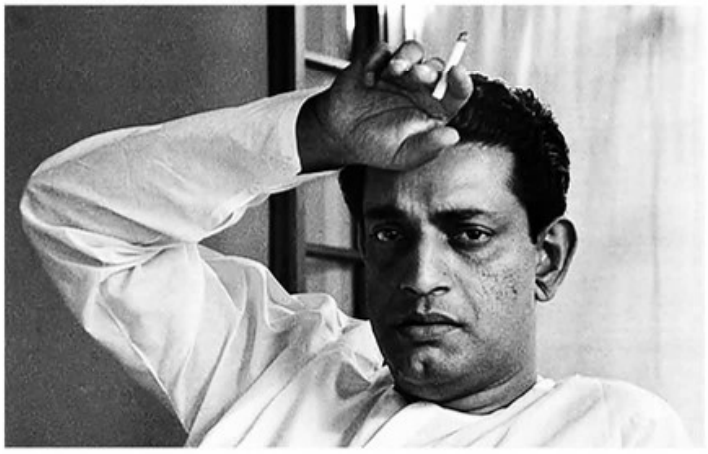

বিশেষ প্রতিবেদন

মেট্রো রেলের গোড়ার কথা

- সৌমিত্র পাল

সাল ১৯৭২, ডিসেম্বর মাস। একদিকে শহরের কেন্দ্রস্থল ইডেনে বসেছে ভারত এম সি সির ক্রিকেট টেস্টের আসর, আরেক প্রান্তে সল্টলেকে, অধুনা বিধাননগরে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে বিরাট মেলা। উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। উপস্থিতির আরেকটা কারণ শিলান্যাস করবেন দমদম – টালিগঞ্জ ১৬.৪৩ কিলোমিটার ব্যাপি Rapid Transit System বা ভূগর্ভ রেলের নির্মাণকার্যের। তারিখ ২৯শে ডিসেম্বর। সেদিন খবরের কাগজে বিশেষ ক্রোড়পত্র, বিশেষ লেখা। যতদূর মনে পড়ে তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী সত্যশরণ মুখার্জি ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী জে এন রায়ের এই রেল পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা। খরচ ১৪৩ কোটি টাকা। নির্মাণের সময় পাঁচ বছর, শ্যামবাজার-বেলগাছিয়ার সামান্য অংশে Tunnelling পদ্ধতির প্রয়োগ। বাকি অংশ cut and cover পদ্ধতিতে। ব্রডগেজ, ১৭টি স্টেশন, দমদম ও টালিগঞ্জ বাদে সব স্টেশন ভূগর্ভে। মেট্রো কোচ নির্মাতা Integral Coach Factory। শিলান্যাস চৌরঙ্গী – পার্ক স্ট্রীট সংযোগস্থলে।

আমি ছোট থেকে রেল অনুরাগী। বাবার কাছে London Tube রেলের গল্প শুনেছি প্রচুর। কলকাতায় ভারতের প্রথম পাতাল রেল চলবে – এই খবরে আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছিলাম।

বিকেলে যথাসময় সভাস্থলে হাজির। এলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে রেলমন্ত্রী টি এ পাই ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। জানলাম এই সভাস্থলের ঠিক নীচেই তৈরী হবে পার্ক স্ট্রীট স্টেশন। আর এই 'রেল মেলে দেবে ডানা, যার নাম গতি'। বহুদিন কৈশোরে উৎসাহ নিয়ে দেখেছি এই প্রকল্পের জন্য রাস্তায় মাপজোক, মাটি পরীক্ষা। সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল Eden Gardens এ রঞ্জি স্টেডিয়ামের নীচে (যা আজ আর নেই) Metropolitan Transport Project (Railways) এর অফিস। ১৯৬৯ সালে Planning Commission এর Metropolitan Transport Team এর এই শহরে দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। ১৯৭২ এর গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেয় এই রেল প্রকল্পে। সেদিনই ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ রেলের বাস্তবায়নের শুভসূচনা। যা সেই সময়ের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক মাইল ফলক।

বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আজ পাতাল রেল বাস্তব। ১৯৮৪ সালের অক্টোবর যে রেলের যাত্রার শুরু, দমদম- টালিগঞ্জের গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ টা উত্তরে দক্ষিণেশ্বর ও দক্ষিণে গড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। লক্ষ লক্ষ যাত্রী সওয়ার। বিরাট কর্মকাণ্ডের ফসল। কলকাতার মাটির উপযুক্ত স্বদেশী প্রযুক্তি, যা এই শহরেই গড়ে তোলা হয়েছে, এনেছে বাস্তবায়ন, যা অন্যান্য শহরের কাছে পরবর্তীকালে এক উদাহরণ।

কলকাতা মেট্রোর সর্বপ্রথম ব্যবহৃত সবুজ হলুদ রেক *ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী*

কলকাতা মেট্রোর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন *সৌজন্যে - পল্লব রায়।*

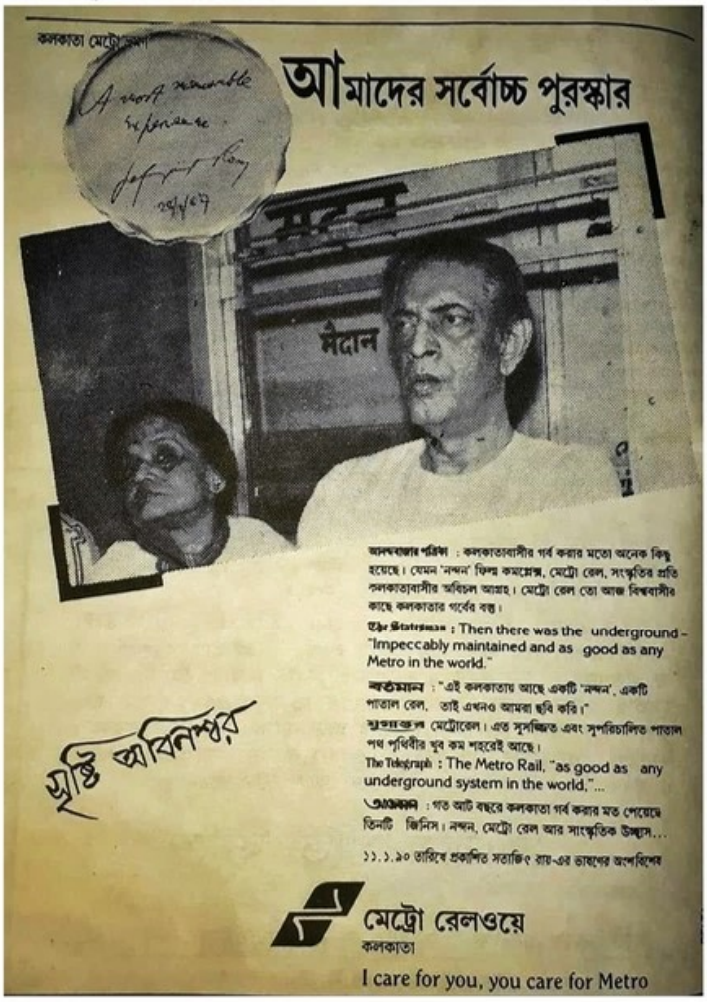

রেলপ্রেমীর ডায়েরি থেকে

- বিপ্লব দেবনাথ

স্টেশন মাষ্টার সুজিতদার পার্সোনাল ফোনটা সকাল থেকেই বেজেই চলেছে। নয় নয় করে সকাল থেকে তাও অন্তত বারছয়েক আমার নম্বরটি সুজিতদার ফোনের কল লিস্টে যোগ হয়েছে। কল রিসিভ হতেই ওপ্রান্ত থেকেই শুনতে পেলাম, "বিপ্লব, বারাসাত স্টেশন ছেড়ে আসছে"। প্রসঙ্গত শুধু সুজিতদা কেন, বিশেষ সেই দিনটিতে সহকর্মী গেটম্যান এবং লাইনে ডিউটিরত সহকর্মীরাও রেহাই পায়নি এই অধমের দূরভাষকেন্দ্রিক অত্যাচারের হাত থেকে। ওই দিনে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম প্রায়। তবুও তারা সবসময়ই হাসিমুখে মেনে নেন এই রেলকেন্দ্রিক পাগলামি। বলা বাহুল্য, এখনও কোনো ইঞ্জিন, মালগাড়ি বা বিশেষ কোনও ট্রেনের এই সেকশনে আগমন ঘটলে, তাঁদের ওপর এই ভালোবাসার 'অত্যাচার' পুনঃসংঘটিত হয়। এবং যেটা হয়তো কখনই থামার নয়।

কিন্তু ঠিক কি ছিল সেই 'বিশেষ দিন'। সেটা জানতে বরং ফিরে যাওয়া যাক একটু অতীতে। ২০১৭ সালের সম্ভবত জুলাই মাসের কোনো এক বিকেল। পশ্চিম আকাশে সূর্যের তেজ তখনও বেশ প্রখর। অশোকনগর আর হাবরা স্টেশনের ঠিক মাঝামাঝি আপ ডাউন দুই লাইনের দুপাশেই লম্বা করে দুটি পুকুর। ডাউন লাইনের পুকুরের ঠিক অপর পাড়েই হাবরা (বানীপুর) মহাশ্মশান। সংস্কারের অভাবে পুকুরটি কচুরিপানা পূর্ন, পানার আড়ালে জলের চিহ্নমাত্র খোঁজা দায়। উল্টোদিকের রেলট্র্যাকের গ্রুড জয়েন্টগুলো রক্ষনাবেক্ষন ছিল সেদিনের ডিউটি। দূরে আকাশজুড়ে কালো ধোঁয়ার আশেপাশের বাতাস চামড়া পোড়া কটু গন্ধে ভারী। তীব্র কটু সেই গন্ধ এড়াবার জন্য সর্বক্ষণের সঙ্গী সুতির লাল কাপড়টি দিয়ে নাকমুখ বাঁধা রয়েছে। সেদিনের মত ট্র্যাকের কাজ শেষ, ঘর্মাক্ত কলেবরে লাইনের পাশে পরিত্যক্ত স্লিপারে বসে একটু বিশ্রাম। অন্যান্য দিনের মতো ডিউটির পর সময়মতো ডাউন ট্রেন ধরে গুমা, সেখানেই ফ্রেশ হয়ে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় আপ ট্রেন ধরে অশোকনগর, তারপরের গন্তব্য সাইকেলে নিজ বাসভবন। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফেরার এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিলো। কারণ একটু আগেই জানা গেল, আর কিছু সময়ের মধ্যেই পূর্ব রেলের মাননীয় মহাপ্রবন্ধকসহ রেলওয়ের উচ্চ-পদাধিকারীরা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক অফিসারেরা বিশেষ ট্রেনে করে পেট্রাপোল সীমান্ত পরিদর্শন করবেন। খবরটি শুনে জাস্ট হতবাক হয়ে গেছিলাম সবাই। এমন কি বিশেষ কারন, যে হঠাৎ করে এরকম হয় অফিশিয়াল পরিদর্শন। অনেক ভেবেও তার কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো কিছু স্মরণীয় ঘটনার চিত্র। ২০১৩ সালে আমার সার্ভিসে যোগদান, তারপর ২০১৪ এর সম্ভবত ৯ জানুয়ারি আমাদের সেকশনে GM পরিদর্শন হয়। সেই পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আমাদের সেকশনে সে এক এলাহী সাজসাজ ব্যাপার। সমস্ত স্টেশন বিল্ডিং-রেলওয়ে ট্র্যাক-ব্রিজ-কারশেড সব একদম ঝকঝকে- তকতকে। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই কারোর। অবশেষে এলো সেই প্রতীক্ষিত ৯ জানুযারির রাত। কনকনে ঠান্ডা আর ভীষন কুয়াশায় দু-হাত দূরের বস্তুও ঠাহর করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উদগ্রীব চিত্তে গুমা প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। যদিও সময়ের হিসেবে পরের দিন চালু হয়ে গেছে। আন্দাজ রাত ওই সাড়ে বারোটার সময় তীব্র হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল GM সাহেবের সেলুন কার। ইঞ্জিন হিসেবে ছিল সম্ভবত লাল রঙের WAP-4, আসলে তখন লোকোমোটিভ সম্পর্কে সেরকম কোনও ধারণাই ছিল না। আন্দাজ করেই বলা আর কি!

আবার গোড়ার কথায় ফেরা যাক। এবারের এই হঠাৎ করেই হাই অফিশিয়াল ইন্সপেকশন শুনে বেশ আশ্চর্যই হয়েছিলাম। বিকেল আন্দাজ পৌনে চারটের আশেপাশে দুটি বাদামি রঙের ইন্সপেকশন কোচ আর কমলা রঙের একটি WDM-3A ইঞ্জিনের

ছবি - সোমভদ্র দাস

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সাথে পেট্রাপোলের দিকে বেরিয়ে গেল GM সাহেবের রেক। তখনও পর্যন্ত এই পরিদর্শন ও নিরীক্ষণের মূল কারণ অজানাই ছিল। পরের দিন খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদন পড়ে ব্যাপারটি পুরো ব্যাপার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। খবর পড়ার ফাঁকে, ঠোঁটের কোনায় ভেসে ওঠা আনন্দের এক চিলতে হাসিটি যদিও বা কেউ খেয়াল করে নি। উক্ত প্রতিবেদনের হেডলাইনটি ছিল এরকম,

"কলকাতা-খুলনা যাত্রীবাহী ট্রেনের চালুর ব্যাপারে রেলকর্তাদের পেট্রাপোল পরিদর্শন"

এরপরের ঘটনা ২০১৭ সালের ৯ই নভেম্বর। সংহতি স্টেশনের ১নং প্লাটফর্মের শিয়ালদহের দিকে একদম শেষপ্রান্তে একটি পাথরের সাথে হেলান দিয়ে নিজস্ব ফোনটির ভিডিও মোড অন করে রাখা। রেকর্ডিং বোতামটি অবশ্য তখনো চালু করা হয়নি। অদূরেই বহুপরিচিত, অভিজ্ঞ রেলপ্রেমী সৌরশঙ্খ মাজি দাদা, দু-দুটো ট্রাইপড ডাউনের দিকে মুখ করে রেখে সঠিক স্থানে বসানোর চেষ্টা চলছে। গলায় ঝুলছে তাঁর প্রিয় নিকনের ছোট ক্যামেরাটি। খানিক পরেই একটি ফোন গেলো LC-25 এর গেটম্যানের কাছে। রিং বেজেই গেল, কিন্তু কলটি রিসিভ হলো না। যদিও কিছুপরেই সেদিক থেকে একটি কল আসে। হন্তদন্ত হয়ে রিসিভ করতেই শোনা গেল, "বন্ধন পাস হচ্ছিল, তাই রিসিভ করতে পারি নি।" ব্যাস, এরপরে আর কোনো কথার অবকাশ নেই! রুদ্ধশ্বাসে ফোনটি কেটে দিয়েই তড়িঘড়ি ক্যামেরার ফাইনাল সেট আপের তদারকি করতে ব্যস্ত হতে হলো। সংহতি যেহেতু ব্লক স্টেশন নয়, তাই স্টার্টার-হোম সিগনালের কোনো বালাই নেই। সবার চোখের অধীর দৃষ্টি হাবরার দিকে। পেছনে হঠাৎ নজর ঘুরতেই দেখা গেল দূরের সবকটি সিগনাল সবুজ আলো জ্বালিয়ে যেন বন্ধনকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। ক্যামেরা আর স্মার্টফোন রেডি করে এদিকেরও প্রস্তুতি তুঙ্গে। যদিও সমস্ত প্রস্তুতি ঠিক থাকলেও ফাইনাল সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, তখন যেন টেনশন একটু হলেও বাড়তে থাকে।ঠিকঠাক সব রেকর্ড হবে তো বা ছবি ঠিকঠাক সব তোলা যাবে তো! কোনো যান্ত্রিক সমস্যা হবে না তো। জানিনা, বিধাতা হয়তো সেদিন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন কিছু একটা আন্দাজ করে।

দূর থেকে আগত ক্ষীণ একটি হর্ন শোনা গেলো ডিজেল ইঞ্জিনের। স্ট্রেট ট্র্যাক যেহেতু, তাই সোজা অনেকটাই নজরে আসে। ক্যামেরা জুম করতেই শিহরণ বয়ে গেল শিরা উপশিরা জুড়ে আর সাথে সাথে বাড়তি অ্যাড্রিন্যালিন নিঃসরণও। ডিপ নীল আর সাদা স্ট্র্যাপের বর্ধমান অ্যালকো WDM-3A ফুলমালা সজ্জিত হয়ে আসছেন। হাত স্থির, ক্যামেরা তাক করা ভালোবাসার পানে। মুহূর্তেই জিগ-জিগ শব্দ করে সামান্য ধোঁয়া তুলে অ্যালকো ইঞ্জিনের সাথে ফুলমালা সজ্জিত হয়ে প্রথমবারের জন্য বাংলাদেশ রওনা হলো কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস। চারিদিকে সুধু ক্যামেরার শার্টার পড়ার শব্দ! জেনারেটর কার চোখের আড়ালে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত থামলো না ছবি তোলা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, জেনারেটর কারের গম্ভীর শব্দটি কেন জানি না, বেশ ভালো লাগে। অবশ্য কারণটি যদিও অজ্ঞাত।

যার জন্য এতো অপেক্ষা আর প্রস্তুতি, সেই অপেক্ষার অবসান হলো নিমেষেই। বিজয়ী

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবিটি লেখকের তোলা

চিত্তে এগোলাম ভিডিও রেকর্ডিং মোডে অন রাখা নিজের দূরভাষ যন্ত্রটির দিকে। কিন্তু এ কি! কোনো সেকেন্ড কাউন্ট করছে না কেন! করবেই কি করে, বেখেয়ালে রেকর্ডিং বোতামটিই তো চালু করা হয়নি। পরে বহুবার বন্ধন এক্সপ্রেসের ভিডিও রেকর্ড করবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু প্রথমদিনের সেই ভিডিও একটু ভুলের জন্য হাতছাড়া হওয়ার আফসোস এখনও কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। যে আফসোস কখনও শেষ হবার নয়।

অশোকনগরে আপে ০৬.৫৭ এর শিয়ালদহ-বনগাঁ (৩৩৮১৭) লোকালে পর প্রায় ৫৩ মিনিটের বিশাল এক গ্যাপ। এরপরেই নয় কোচের (৩৩৬৫৩) শিয়ালদহ-হাবরা লোকাল। সামনে কোনো ট্রেন না থাকায় এই ট্রেনটি সাধারণত লেট করে না। কিন্তু বৃহস্পতিবার আর রবিবার NTES/WIMT অ্যাপে এই ৩৩৮৫৩ কে ট্র্যাক করে যখনই নজরে আসত 'Arrived at Dattapukur' এবং 'Delay by 6 Minutes' এই লেখাদুটি, তখন আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হতো না। কারণ এর মানেই হলো, আপ হাবরা লোকালকে দত্তপুকুর ২ নং প্লাটফর্মে হল্ট করিয়ে বন্ধনকে ৩ নং দিয়ে পাস করাবে। আর যেহেতু এই সময় আপে আর কোনো ট্রেন নেই, তাই বন্ধনকে সেদিন আর পায় কে। বন্ধনের LP আর ALP রাও খুশি, সাথে সাথে আমিও।

কিন্তু খুশির সময়, সে তো বড়ই ক্ষণজন্মা। যদি বন্ধন এক্সপ্রেসের ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে গিয়ে অনেক সময়ই দেখা যায়, যে ৯-কোচের শিয়ালদহ-হাবরা লোকাল বেরিয়ে যাচ্ছে, মন একটু হলেও খারাপ হয়ে যায়। কারন বন্ধন পেছনেই ধুঁকতে ধুঁকতে সিঙ্গল ইয়েলো বা ডাবল ইয়েলোতে আসছে। অনেকবারই দেখা গেছে বন্ধনকে অশোকনগরে দাঁড়িয়ে যেতে। কারণ সামনের আপ হাবরা লোকাল হাবরায় ২ নং প্লাটফর্মে ঢোকেনি যে। তখন আর কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি নীল-লাল লিঙ্ক হফম্যান বুশ কোচগুলোকে আর অনুভব করতে থাকি EOG এর গম্ভীর আওয়াজকে। এবং মনে মনে যাত্রীসংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, যাতে এই এক্সপ্রেসের গুরুত্ব আরও বাড়ে। ইতিমধ্যেই অদূরের অ্যাডভান্স স্টার্টার সিগনালে ডাবল ইয়েলো শো করছে, মানে যশোর রোডের ওপর LC-27 আর LC-28 (হাবরা আপ হোম) ক্লিয়ার আছে, কিন্তু হাবরা স্টার্টার হয়নি তখনও। কানে আসলো, ডিজেল ইঞ্জিনের খানিক ধোঁয়া উদ্গীরণ আর বিখ্যাত সেই জিগ-জিগ শব্দ। সাথে লম্বা একটি হর্ন মেরে পেট্রাপোল-বেনাপোলের দিকে ছুটে চলা বন্ধনের।

যদিও বিজাতীয় আনন্দ অন্য এক ভাবেও অনুভব করে থাকি। ডাউনে ফেরার পথে যতদূর চোখ যায়, সবকটি সিগনাল সবুজ হয়ে জ্বলজ্বল করছে বন্ধনকে স্বাগত জানানোর জন্য। অশোকনগর হোম, অশোকনগর স্টার্টার, অ্যাডভ্যান্স স্টার্টার থেকে শুরু করে LC-২৫/২৪, গুমা হোম, গুমা অ্যাডভ্যান্স স্টার্টার সব এক্কেবারে সবুজ, মায় বিড়ার 21 নং গেট পর্যন্ত ক্লিয়ার থাকে। তাছাড়া সিগনালের অ্যাসপেক্ট পরিবর্তন হওয়া দেখাও দারুন একটা ব্যাপার। কখনও হলুদ থেকে ডাবল হলুদ, আবার সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ডাবল হলুদ থেকে পুরোপুরি সবুজ হয়ে যাওয়া, বেশ একটা মনোমুগ্ধকর ব্যাপার। কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ডান হাতে লাল আর বাঁ-হাতে সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে যতদূর যায়, সবকটি সিগনাল পোস্টের সবুজ আলোর যেন পুরো গ্রীন করিডর তৈরি করা আছে। ঠিক যেন হাওড়া কর্ড লাইনে রাজধানী পাস করে যাবার মত অনুভূতি হয়। মুহূর্তের মধ্যেই ডিজেল ইঞ্জিনের LHB রেক নিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চল। গর্ব অনুভব করি যে, আমাদের সেকশন দিয়েও একটি আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করে। গর্বে যতটুকু বুকটা চওড়া হয়, জোর করে বুকটা আরও যেন একটু অতিরিক্ত ফুলিয়ে নি!

কখনও চমৎকৃত হই স্পিড দেখে, কখনও বা অ্যালকো ইঞ্জিনের মাথার ওপর ধোঁয়া উঠতে দেখে। আবার কোনোদিন অবাক হয়ে যাই, চিরাচরিত বর্ধমান শেডের ইঞ্জিনের পরিবর্তে জামালপুর এর ইঞ্জিন নজরে পড়লে। যেটা অফলিঙ্ক হিসেবে রেলপ্রেমীদের কাছে অসাধারন এক প্রাপ্তি। বারাসাত বনগাঁ সেকশনে ট্রেনের গতিবেগের উর্ধসীমা হলো ৯০ কিমি/ঘন্টা। প্রচলিত রাজধানী এক্সপ্রেসের রুটের চাইতে হয়তো অনেকটাই কম ঠিকই। যদিও না এর থেকে বেশি স্পিডের প্রয়োজন পড়ে না। এই সেকশনে বিশেষ করে হাবরার পর থেকে স্টেশনগুলোর দূরত্ব বেশ অনেকটা আর ট্রেন ট্র্যাফিকও অনেকটাই কম। হাবরায় পরে বনগাঁর দিকে ট্রেনগুলো ভালোই স্পিড তোলে। আর একটি ব্যাপার, বন্ধন হোক আর যেকোনো ট্রেনই বা হোক, ক্রমাগত হর্ন মারতে মারতে ৮০-৯০ কিমি বেগে প্লাটফর্মে ক্রস করলেই মনে হয় ভীষন স্পিডে যাচ্ছে, দেখেও চক্ষু সার্থক। অদ্ভুত এক মুগ্ধতা কাজ করে, তা তো অস্বীকার করা যায় না।

এরকমই এক বিকেলে ঠাকুরনগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, ডাউন বন্ধনের ছবি তুলবো বলে। স্টেশন ছাড়িয়ে বনগাঁর দিকে লাইনে অনেকটা বাঁক রয়েছে। বন্ধনের ভিডিও রেকর্ড করার ইচ্ছে নিয়েই আসা। একদম রাইট টাইমে প্রায় ৮৫-৯০ কিমি বেগে তীব্র হর্ন মারতে মারতে প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। বিভূতিভূষণ হল্ট স্টেশনেও একদিন পেয়েছিলাম এরকম কাঁপানো গতি। অনেক ইচ্ছাই জীবনে অপূর্ন থেকে যায়। যেরকম আমারও খুব ইচ্ছে ছিল পেট্রাপোল আর বনগাঁর মাঝে বনগাঁ-বাগদা স্ট্রেচের জন্য গঠিত কেবিন থেকে বন্ধন এক্সপ্রেসের ছবি তোলা। সিঙ্গল লাইন, ওভারহেড নেই, অল্প একটু বাঁকও আছে। গাছপালার মাঝে অসাধারণ একটি দৃশ্য আসতো। কিন্তু বাঙালি তো, আজ-কাল করে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে কবে সম্ভব হবে ঠিক নেই। তবুও কথায় বলে, আশায় বাঁচে চাষা!

অদ্ভুত আরেকটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলাম অশোকনগরে। স্টেশনে বসে আছি, স্টেশনের ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে বিকেল ০৪.২২। NTES এ ১৩১৩০ কে ট্র্যাক করতেই দেখালো, "Departed Petrapole, 2 Minutes ago"। দেরি আছে অনেক, ওভারব্রিজ পেরিয়ে ১ নং প্লাটফর্মের শেডের নীচে যাওয়া গেল হালকা কিছু জলখাবারের টানে। 'স্বাদ ঘর

ছবিটি লেখকের তোলা

ছবিটি লেখকের তোলা

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবিটি লেখকের তোলা

চাট সেন্টার' নামে এখানে একটি দোকান আছে প্লাটফর্মের ওপর। বেশ ঝকঝকে দোকান, আর এই দোকানে কত রকমারি পাপড়ি চাট পাওয়া যায়, তা বলে শেষ করা যাবে না। পাপড়ি চাট ছাড়াও নানা স্বাদের মুড়িমাখা, কাঁচা ছোলা মাখাও দারুন তৈরি করে। একবার খেলে সত্যিই ভোলা যায় না। ওদিকে ডাউন বন্ধনের সময় এগিয়ে আসছে, NTES এ দেখালো, 'Departed Sanghati'। খেতে খেতেই NTES এ আবার শো করলো যে, হাবরা ছেড়ে দিয়েছে। ক্যামেরা নিয়ে রেডি হলাম। কিন্তু একি, পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায় বন্ধনের কোনো খবরই নেই। আর অদ্ভুত ব্যাপার, স্টেশনেও থ্রু ট্রেনের কোনো ঘোষণা নেই আর সব সিগনালগুলোই 'অন' অবস্থায় আছে। ভাবলাম, যশোর রোডের ওপর স্পেশাল LC-২৪ বা LC-২৭ এ কোনো সমস্যা হয়েছে, তাই হয়তো আসতে লেট করছে। কিন্তু পুনরায় NTES ট্র্যাক করতেই বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়! অ্যাপে শো করছে, 'Departed GUMA, 2 Minutes ago'! বন্ধন তো অশোকনগর ক্রসই করে নি এখনো পর্যন্ত, তাহলে গুমা কীভাবে গেল! NTES অ্যাপ কি বিগড়ে গেল। আধঘন্টা হয়ে গেল, তখনও কোনো ঘোষণা নেই বন্ধনের, অবাক কান্ড! বাড়ি যাবার জন্য গ্যারেজ থেকে সাইকেলও বের করা হয়ে গেছে। হঠাৎই প্লাটফর্মের মাইকে ভেসে আসলো, "২ নম্বর লাইন দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, কেউ লাইন পারাপার করবেন না"। হেমন্তের বেলা, অন্ধকার হয়ে এসেছে স্টেশন চত্বর। কিছু সময় পরেই বন্ধন যখন পাস করলো, ঘড়িতে তখন প্রায় ৬টা বেজে ৬ মিনিট। আপে বারাসাত-বনগাঁর খবর হয়ে গেছে। আর NTES অ্যাপ শো করছে, "13010 Departed From DumDum Jn."

বনগাঁ-শিয়ালদহ সেকশনে লেভেল ক্রসিং গেটের সংখ্যা প্রচুর, তার মধ্যে অনেকগুলো

ছবিটি লেখকের তোলা

আবার স্পেশাল ক্লাস গেটও আছে। আর এদিকে যেহেতু কিছুক্ষন পর পর লোকাল ট্রেন চলে, তাই একটু গেট লক থাকলেই গাড়ির লাইন পড়ে যায়। গাড়ির লাইনের পাশাপাশি অবশ্য কিছু পাবলিকের মুখে গেটম্যানের উদ্দেশ্যে গালমন্দেরও ধুম পড়ে যায়। কর্মরত অবস্থায় গেটম্যানদের চামড়া পুরু থাকা আবশ্যক, তাই এখানে দুই কানের সঠিক প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। বন্ধনের খবর হলে মোটামুটি কিছু আগে থেকেই গেটে খবর দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ট্রেন, তাকে তো অগ্রাধিকার দিতেই হয়। তাই গেট লক করা হয় কিছু সময় আগে, আর ওদিকে সময়ের সাথে সাথে রোড ভেহিকলেরও লাইন সর্পিলাকারে বাড়তে থাকে। পাবলিক অধৈর্য্য হয়ে চিল্লামেল্লি শুরু করলেই কিংবা গেট খোলার জন্য ক্রমাগত হর্ন মারতে থাকলেই গম্ভীরস্বরে শুধু বলতে হয়, 'বন্ধন ঢুকছে'। ব্যস, সবাই একদম নিশ্চুপ, আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। কারণ এদিকের মানুষ এতদিনে জেনে গেছেন, যে এক্সপ্রেস ট্রেনকে অনেক আগে থেকে লাইন ক্লিয়ার দিতে হয়। অনেকে তো বেশ খুশিও হয় মনে মনে। অনেকে রীতিমতো মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে পকেট থেকে স্মার্টফোন বের করে ভিডিও রেকর্ডিং করাও শুরু করে দেয়। স্বভাবতই, ব্যাপারটি বেশ উপভোগ্য।

এই বিষয়ে বিশেষ একটি অনুভূতি এখানে উল্লেখ্য, যেটা না বললেই নয়, সেটা হলো বন্ধন এক্সপ্রেস নিয়ে এদিকের মানুষের উন্মাদনা। অনেক আগেও এই লাইন দিয়ে বাংলাদেশে যাত্রীবাহী ট্রেন চলতো, তারই স্মৃতিকথন শুনি অনেক বয়স্ক মানুষের মুখ থেকে। খুলনা-বরিশালের কত রকম উদাসী স্মৃতি রচিত হয় তাঁদের মুখের মানচিত্র জুড়ে। বন্ধন চালু হওয়ার পর তাদের মুখে আনন্দের অনুভূতিও দেখবার মতো। সেই ২০১৭ সালে বন্ধন চালু হয়েছে, কিন্তু এখনো প্রচুর মানুষের মধ্যে এর উন্মাদনা যেন বেড়েই চলেছে। বন্ধন না, এইসব মানুষগুলো কাছে এই ট্রেন "বাংলাদেশের ট্রেন" নামেই বিশেষ পরিচিত। পুরোনো কেবিনে, গুমা ব্রিজে কিংবা অশোকনগরে ছবি তুলতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো এবং তাঁদের মায়ের রীতিমতো ভিড় করে এই বাংলাদেশের ট্রেন দেখবে বলে। ট্রেন আসলেই চিৎকার আর হাততালিতে বন্ধনকে অভিবাদন জানায় তারা। বন্ধনের চলার দিন গেট ডিউটি থাকলে কত মানুষ এসে যে জিজ্ঞাসা করে, "দাদা, বাংলাদেশের ট্রেনের সময় কত?" যদি কোনদিন বাইচান্স ট্রেন চলে যাওয়ার সেইসব মানুষগুলির আগমন হয় তাহলে তাদের মুখের বিষণ্ণতার অভিব্যক্তি মন সত্যিই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বন্ধন যেন সত্যিই ভালোবাসার আর সম্প্রীতির বন্ধন এবং আমাদের আবেগ।

প্রচ্ছদ চিত্রঃ সোমভদ্র দাস।

ছোট রেলে ইতিকথা

- অর্কোপল সরকার

'কাটোয়া' - পূর্ব বর্ধমানে অবস্থিত এই জনপদটি সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই রেল মানচিত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক শহর যা শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর সাথে বর্ধমান জেলার যোগাযোগ তৈরিতে এক অপরিসীম ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ব্রিটিশ আমলে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ছোট বড় গ্রামের যোগাযোগ মাধ্যমকে উন্নত করতে কাটোয়াকে কেন্দ্র করে চালু হয়েছিল দুইটি ছোট রেলের শাখা, যা তৈরির পিছনে ছিল ম্যাকলিওড এন্ড কোম্পানি। মূলত এইটি একটি বেসরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, এদের তৈরি রেলকে বলা হতো ম্যাকলিওড লাইট রেলওয়ে। এইরকম আরো একটি কোম্পানির নাম ছিল মার্টিন রেল। এই দুইটি কোম্পানির সব রেলওয়ে শাখা গুলিই ছিল ন্যারোগেজ, অর্থাৎ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি অথবা ৭৬২ মিলিমিটার।

ম্যাকলিওড লাইট রেলওয়ে শুধু কাটোয়াতে নয়, একটু ইতিহাসের পাতা ঘাটলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই এর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, এর মধ্যে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য রেলপথ গুলি হলো, বাঁকুড়া রায়নগর যেটির 'বি ডি আর অথবা বাঁকুড়া দামোদর ভ্যালি রেলওয়ে' নামে খ্যাত আর একটি রেলপথ ছিল কালীঘাট থেকে ফলতা পর্যন্ত যাকে সংক্ষেপে 'কে এফ আর' বলা হতো।

এই রেল শাখাগুলির প্রথম যুগে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন গুলি দিয়ে ট্রেন চালানো হতো, সেই ইঞ্জিন গুলির নামকরণ একটি সেই শাখার নামকরনের উপর রাখা হতো। যেমন AK16, AK এর অর্থ হল আহমদপুর-কাটোয়া তারপর KF-10 এখানে KF এর অর্থ হল কালীঘাট-ফলতা এবং এভাবেই বর্ধমান কাটোয়ার লোকোর নামকরণ শুরু হতো 'BK' দিয়ে। ইঞ্জিনের এই ধরণের নম্বর দেওয়ার জন্য এখন যেগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে কোন ইঞ্জিন কোন শাখায় চলতো। লোকো গুলির কিছু কিছু এখন বিভিন্ন ষ্টেশন ও বিভিন্ন রেল মিউজিয়াম এ সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন হাওড়া স্টেশনের প্রবেশদ্বারে একটি AK শাখার ইঞ্জিন আলোয় সুসজ্জিত করে সংরক্ষিত আছে।

১৯৫৭ এর কিছু আগে থেকেই এই বেসরকারি রেল কোম্পানি গুলো আর্থিক ভাবে ধুঁকতে শুরু করে ও বিনা টিকিটের যাত্রী বহুল পরিমানে বেড়ে যাওয়ায় রেল শাখাগুলি ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিছু রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়, যেমন ১৯৫৭ সালে কালীঘাট ফলতা লাইট রেলওয়ে বন্ধ হয়ে যায়, উক্ত স্থানে পরে একটি রাস্তা নির্মিত হয় যা জেমস লং সরনি বলে পরিচিত।

পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার রেলকে অধিগ্রহন করার পর কিছু কিছু শাখা ব্যতিক্রমী হিসেবে বন্ধ হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়; যেমন বাঁকুড়া-রায়নগর, কাটোয়া-বর্ধমান, কাটোয়া-আহমদপুর। এই শাখাগুলির মধ্যে বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং আর্থিক ভাবে লাভের মুখ না দেখে বাঁকুড়া রায়নগর দামোদর উপত্যকা রেলের শাখাটি ১৯৯৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন ভারতে এটিই বোধহয় বাংলার প্রথম ছোটরেল যা স্টিম ইঞ্জিনের যুগেই ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৮ সালে দক্ষিন-পূর্ব রেলওয়ে এই শাখার ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে রুপান্তর করার কাজ শুরু করে এবং ২০০৫ সালে রায়নগর অবধি ও ২০১২ সালে মসাগ্রাম অবধি

ছবি - অর্কোপল সরকার

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সম্প্রসারিত হয়ে হাওড়া বর্ধমান কর্ড শাখার সাথে যুক্ত হয়। একই ভাবে কাটোয়া-আহমেদপুর বন্ধ হয়ে যায় ২০১৩ সালে ও পরবর্তীতে এটিও ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

কালের নিয়মে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সবাইকেই বদলাতে হয়, তাই একে একে এই শাখা গুলি বড় হয়ে হয়তো ব্রডগেজ এ রূপান্তরিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু হারিয়ে গেছে ভালোবাসার সেই ছোট রেল।

আমরা এই পর্বে হারিয়ে যাওয়া বাংলার সেই ছোট রেলের একটি শাখার উপর আলোকপাত করবো – কাটোয়া-বর্ধমান রেলপথ।

১৯১৫ সালের পয়লা ডিসেম্বর, ম্যাকলিওড লাইট রেলওয়ের কাটোয়া-বর্ধমান শাখার প্রথম ট্রেনটি যাত্রা শুরু করেছিল বিকেল চারটের সময়, সেইসময় দুইটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন দ্বারা চার কামরার গাড়ি চলতো। এই ট্রেনগুলির একটি কামরাতে, রবিবার বাদে সপ্তাহে চারদিন ডাক যেত, রেলের ভাষায় যাকে RMS (Railway Mail Service) বলা হয়।

এর সাথে পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয়েছিল দুটি রেলবাস, যেগুলো তে নীল সাদা ও সবুজ হলুদ এই দুইটি রঙের ব্যবহার দেখা যায়, এইগুলোতে বাসের মতো প্রথম কোচ টিতে মোটর থাকতো, যা দিয়ে বাকি ৩-৪ টি কামরা কে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। রেল বাসগুলোতে এই কারনে যাত্রীধারন ক্ষমতা ও অনেক বেশি থাকতো। এতে মোটর কোচের পিছনের কামরাগুলো কে বলা হয় ট্রেলার কার, আর শেষ কামরায় গার্ডের বসার জন্য একটি ছোট্ট ঘর থাকতো।

১৯৬৬ সালে রেলপথটি ভারত সরকার দ্বারা অধিগৃহীত হয় ও ভারতীয় রেলের আওতাধীন পূর্ব রেলের হাওড়া মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিঙ্গেল লাইন হওয়ার দরুন দুইটি ট্রেন কে চালানোর জন্য এই রেলপথে অনেকগুলো ক্রসিং পয়েন্ট ছিল বিভিন্ন ষ্টেশনে, যেমন- করজনা, ভাতার, বলগনা, নিগন, কৈচর, শ্রীখণ্ড। যদিও আর্থিক ক্ষতি ও পরবর্তী সময়ে গুরুত্ব কমে আসার কারণে ধীরে ধীরে ট্রেনের সংখ্যা কমতে থাকে যার ফলে ক্রসিং পয়েন্ট গুলো প্রায় সবই উঠে যায়, শেষের দিকে শুধুমাত্র বলগনা তে ক্রসিং পয়েন্ট চালু ছিল। শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহন নয়, পন্য পরিবহনেও এই রেলপথের ভূমিকা ছিল অপরিসীম, আশেপাশের অঞ্চল থেকে খাদ্যসামগ্রী তথা নানাবিধ পণ্য আনা নেওয়ার মাধ্যম ছিল এই রেলপথ। এই শাখার পণ্যবাহী গাড়ির নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় কাটোয়াতে ন্যারোগেজ কারশেডে। প্রধানত পণ্য পরিবহনের জন্যই বিভিন্ন ষ্টেশনে ক্রসিং পয়েন্ট গুলি রাখা হয়েছিল, কিন্তু ব্যস্ততার যুগে ধীরে ধীরে এই মাধ্যম গুরুত্ব হারায় এবং পরে পণ্য পরিবহন বন্ধ হওয়া তথা ট্রেনের সংখ্যাও হ্রাসের ফলে সেগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যাক্ত হয়ে যায়। গোটা শাখাটি সিমাফোর সিগন্যালিং ব্যাবস্থা দ্বারা পরিচালিত ছিল। ট্রেনের সংখ্যার হ্রাসের ফলে সিগন্যালিং ব্যবস্থার ও প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায়। শেষের দিকে 'one train only' এই পদ্ধতিতে বর্ধমান বলগোনা ও বলগোনা কাটোয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল অব্যাহত ছিল।

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবি - সৌরশুভ্র মাজি

ছবি - সৌরশঙ্খ মাজি

এই শাখার ট্রেনগুলির গতিবেগ ছিল ঘণ্টা প্রতি ২৮ কিমি, পরবর্তীকালে তা কমে হয় ২২ কিমি / ঘণ্টা, এরপর বন্যায় মাটি আলগা হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন লাইন মেরামতির শেষে ট্রেন চালু হয় তখন গতি একেবারে কমিয়ে ১০ কিমি/ ঘণ্টা করে দেওয়া হয়। সমগ্র রেলপথ টিতে মোট ষ্টেশন সংখ্যা ছিল ১৬টি, ক্রমানুসারে তা ছিল এরকম - বর্ধমান, কামনারা, খেতিয়া, চামারদিঘি, করজনা, করজনাগ্রাম, আমারুন, ভাতার, বলগনা, সাওতা, নিগন, কৈচর, বনকাপাসি, শ্রীখণ্ড, শ্রীপাট শ্রীখণ্ড ও কাটোয়া।

বিশেষ বিশেষ দিনে এই রেলপথে একটি লাল রঙের কামরা যুক্ত কাঠের সিট দেওয়া ইঞ্জিন চালিত গাড়ি আসার উল্লেখ পাওয়া যায় নানা মাধ্যমে। এই গাড়ীর কাজ ছিল মূলত বিভিন্ন স্টেশন থেকে রেলের টিকিট বিক্রির অর্থ সংগ্রহ করা। ইঞ্জিন চালিত এরকম লাল রঙের গাড়ি কাটোয়া-আহমদপুর শাখাতেই মূলত চলাচল করতো।

বর্ধমান স্টেশনের ন্যারোগেজ শাখার শেষভাগে ছিল একটি বড় টার্ন টেবিল, যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে মাটির নিচে। ইঞ্জিন ঘোরানোর কাজে ব্যবহৃত হলেও পরের দিকে এই শাখায় ব্যবহৃত রেলবাসের মোটর কোচগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য টার্ন টেবিল এর প্রয়োজন পড়তো। যাতে সেটি আবার কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। টার্ন টেবিলে কামরা ঘোরানোটা বড়দের কাছে একঘেয়ে হলেও কচিকাঁচাদের কাছে খুব উৎসাহের ব্যাপার ছিল। দিনে যে কবার ট্রেন আসতো, তারা দৌড়ে গিয়ে চেপে যেত মোটর কারে কারণ টার্ন টেবিলে চড়ে ঘুরবে। কেউ কেউ তো আবার স্বতপ্রণোদিতভাবে লেগে পড়তো

ছবি - সৌরশঙ্খ মাজি

ছবি - সৌরশঙ্খ মাজি

টার্ন টেবিল ঘোরাতে।

শেষের দিকে প্রচণ্ড পরিমানে আর্থিক ক্ষতিতে চলা রেলশাখাটি হয়তো এরপর এই গতির যুগে এমনিই হারিয়ে যেত, যদি না এই শাখাটিতে NTPC র নজর পড়তো। কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়বার লক্ষ্যে কয়লা পরিবহন করবার জন্য এই রেল শাখাটিকে গেজ কনভার্সন করার প্রস্তাব রাখা হয় NTPC এর পক্ষ থেকে যা খুব তড়িঘড়ি স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৯ সালে ১১০ কোটি টাকা রেলকে দেওয়া হয় NTPC এর তরফ থেকে এই শাখার গেজ কনভার্সন কাজের শুরু করবার জন্য।

২০১০ সালের ১৫ই এপ্রিল এই রেল শাখার প্রথম পর্যায় বর্ধমান থেকে বলগনা পর্যন্ত ছোটলাইন বন্ধ করে বড় লাইন গড়ার কাজ আরম্ভ হয়, যা সমাপ্ত হয় ৪ বছরের মধ্যে এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে বর্ধমান থেকে বলগনা বড় লাইনের ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়ে যায়। উক্ত সময়ে বলগনা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ছোট লাইন চালু ছিল, কিন্তু ছোট লাইনের শাখা হয়ে গিয়েছিল ছোট, ট্রেনের সংখ্যাও অনেক কমে গিয়ে হয়েছিল ছোট, কিন্তু সেই ছোটরেলের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। লক্ষ্য করা যায় শেষের ওই সময়ে ছোটরেলের এই ছোট্ট শাখাটি নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির মাঝে গাছ পালা দিয়ে ঢাকা রেলপথটি এখানকার মানুষের কাছে ছিল বড়ই আপন, ট্রেনটির ফাঁকা মাঠ, কারুর বাড়ির উঠোন দিয়ে ঘণ্টায় ১০ কিমি গতিবেগে ছুটে

ছবি - সৌরশঙ্খ মাজি

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবি - সৌরশঙ্খ মাজি

যেত। সেইসময় গতিবেগ কম হওয়ায় বহু মানুষ তাদের বাড়ি থেকেই ওঠা নামা করতেন। টিকিটের বিশেষ বালাই না থাকায় রেলপথটির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বড়ই উদাসীন ছিলেন। তাদের কাছে এই রেলপথের ভবিষ্যৎ হয়তো অন্ধকারই ছিল। তবুও এই ছোট লাইন ছিল ভালবাসার, মানুষের হৃদয়ের বড়ই কাছের, এখানে কর্মরত কিছু রেলকর্মী যারা এখন বড় রেলে চাকরি করেন, তারা এখনো কিন্তু প্রতিনিয়ত মনে করেন তাদের ছোট রেলকে। তাদের গল্পে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে হারিয়ে যাওয়া ছোট রেল। রেলকর্মী নয় তারা সমাদর পেতেন ওই শাখায় ঘরের লোকের মতোই। খাবার দাবার থেকে চিঠি পত্র আদান প্রদান, প্রতিটি ঘরের সুখ দুঃখের কথার বিনিময় ও হতো রেলকর্মীদের সাথেই। আজও ওই শাখায় যাত্রা বা কাজ করার সময় বড় স্টেশনের নীচে হারিয়ে যাওয়া ছোট রেলকে তারা প্রত্যক্ষ করেন প্রতিনিয়ত। অভাব বোধ করেন কৈচর ষ্টেশনের সেই বটবৃক্ষের ছায়াতলে বসা আড্ডাগুলো।

বলগনা-বর্ধমান শাখায় বৈদ্যুতিক লোকাল ট্রেনের মাধ্যমে বড় ট্রেনের যাত্রা শুরু হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল -- ২০১০ থেকে ২০১৩ এর মধ্যে একে একে গেজ কনভার্সন কাজের জন্য রাজ্যের বাকি ছোট রেল শাখা গুলি ও বন্ধ হয়ে যায় ; যেমন ২০১১ তে বন্ধ হয়ে যায় মন্দির নগরীর ছোট ট্রেন শান্তিপুর নবদ্বীপ ঘাট রেলপথ ও ২০১৩ তে বন্ধ হয় কাটোয়া আহমদপুর, তাই বলগোনা কাটোয়া শাখাটিই ছিল এই রাজ্যের শেষ ছোট রেলের শাখা, যা অবশেষে ২০১৪ সালের পয়লা ডিসেম্বর

ছবি - সৌরশঙ্খ মাজি

গেজ পরিবর্তনের কাজের পথ প্রসস্থ করার জন্য বিদায় নেয়। শেষের সে দিন ছিল এক অন্যরকম উন্মাদনার, এই রেল লাইন কে ঘিরে গড়ে ওঠা অনেক জনপদ ও সেখানকার হাজার হাজার মানুষ সেদিন গান বাজনা সহযোগে চোখের জলে বিদায় দিয়েছিল তাদের আদরের ছোট রেলকে। শতবর্ষের পাদানিতে পা রেখে এরাজ্যে যাত্রা সমাপ্তি হয়েছিল বঙ্গ জীবনের এক অঙ্গ ছোট রেলের।

পুরনো সেই সোনালী দিনগুলো হারিয়ে গেছে স্মৃতির পাতাতেই, তারই কিছু কিছু চিহ্ন এখনো খুঁজে পাওয়া যায় কাটোয়া ষ্টেশনের এক কোনায়। ছোট রেলের পথ আজ রুদ্ধ, তাই ট্রেনগুলিও চিরনিদ্রায় মগ্ন জরাজীর্ণ অবস্থায়, বড়ই অবহেলায়। খুঁজে পাওয়া যায় সেই লালরঙা কাঠের কামরা গুলো যাতে করে রেলের অর্থ আসতো। নিতান্তই অবহেলায় পড়ে রয়েছে সেই সবুজ হলুদ রেলবাসগুলি। ভিতরে উঁকি দিলে দেখা যায় যে সীট, কামরার লাইট সবই আছে, তবে পরিত্যাক্ত, মাকড়শার জ্বালের আড়ালে । অবহেলায় পড়ে আছে ৫টি ZDM Category -র ইঞ্জিন যাদের আওয়াজে একসময় এই জায়গা গমগম করত। এক যুগ আগের সদাব্যাস্ত শেডটিতে এখন শ্মশান-সম নিস্তব্ধতা, পাশ দিয়েই চলে গেছে বর্ধমান যাওয়ার বড় লাইন, মাঝেই মাঝেই নীরবতা কে ছিন্ন করে ছুটে যায় বড় রেল, তারই পাশে জীর্ণ হয়ে অন্ধ কুঠুরিতে পরে থাকা ছোট রেলের ট্রেনগুলো যেন এখনো পুরনো দিনের গল্প বলে চলেছে।

২০১৭ সালের ২৫ শে আগস্ট প্রথম বৈদ্যুতিক বড় ট্রেনের যাত্রা শুরু হল বলগনা থেকে কাটোয়ার উদ্দেশ্যে, অবশ্য তার যাত্রাপথ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড অবধি রেখে দেওয়া হয় কারন দুটি বড় প্লাটফর্ম ৬ ও ৭ নম্বর তখন ও পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি, বলা বাহুল্য এই দুটি প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছে কাটোয়াতে বর্ধমান শাখার গাড়ি নেওয়ার জন্য। ওদিন প্রথম বড় ট্রেনটি বর্ধমান ছেড়েছিল দুপুর ঠিক ২ টো নাগাদ, শ্রীপাট শ্রীখণ্ড পৌঁছতেই যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় যাত্রীদের তথা স্থানীয়দের মধ্যে, সাঁওতালি নৃত্য , গান বাজনার মাধ্যমে বরন করে নেওয়া হয় আদরের ছোট রেলের বড় হয়ে আসা কে, বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিটে ট্রেন টি শ্রীপাট শ্রীখণ্ড থেকে বর্ধমান উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অবশেষে সবরকম বাঁধা অতিক্রম করে সেই দিন আসে, অর্থাৎ ১২ ই জানুয়ারি ২০১৮, বিকেল ঠিক চারটের সময় প্রথম বড় ট্রেন বর্ধমান থেকে ছেড়ে কাটোয়া পৌঁছায়, শুরু হয় কাটোয়া বর্ধমান লাইনের এক নতুন অধ্যায়।

আজকে হারিয়ে গেছে সেই টার্ন টেবিল, হারিয়ে গেছে সেই ছোট রেল, হারিয়ে গেছে ছোট রেল দেখে শৈশবের সেই উন্মাদনা। শৈশব অগ্রগতির সুপারফাস্টে চেপে এগিয়ে চলেছে সামনে কিন্তু কোথাও যেন ভালোবাসার সেই ছোট্ট রেল আমাদের শৈশবকে এখনো হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সৌরশঙ্খ মাজি।
প্রচ্ছদ ছবি - অভিষেক রায়।

জন্মলগ্নে পূর্ব রেল

- প্রশান্ত কুমার মিশ্র

পূর্ব ভারতীয় রেলের (অধুনা পূর্ব রেল) সূচনাকালে, এই প্রকল্পকে এক জনৈক বেকার স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ারের উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা এবং একটি অবাস্তব পরিকল্পনা হিসেবে দেখা হতো। ১৮৪৫ সালের ইংল্যান্ডের রাস্তা-ঘাট নাকি এই ধরনের বেকার যুবকদের উদ্ভট পরিকল্পনার আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার তাগিদে ভারতে পাড়ি দিত এবং পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান করে বেড়াত। স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব ভারতের এই রেল লাইন কলকাতা বা হাওড়া সঙ্গে মির্জাপুর কে সরাসরি যোগ করার কথা ছিল। তিনি এই কাজে নেমেছিলেন বটে কিন্তু তার ভারত সম্বন্ধে সম্যক ধারনা ছিল শূন্য। এই অঞ্চলের মাটির গতি-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জন-মানসের প্রতিক্রিয়া এবং সর্বোপরি এই রেল থেকে উপযুক্ত আয়ের সঠিক সমীক্ষা না করেই মাইলের মাইল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠঘাট, নদী-নালা, বন্যপ্রাণীসঙ্কুল জঙ্গল ও জনমানব শূন্য এলাকার মধ্যে দিয়ে রেল লাইন পাতার কাজে নেমে পড়েন। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে হাওড়া থেকে রাজমহল (রানীগিঞ্জ) অবধি একটি পরিক্ষামুলক রেলপথ নির্মাণ করার জন্য, একটি ট্রাস্টি বোর্ডও পেয়ে যান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। পরবর্তী পদক্ষেপে East Indian Railway Company (EIR) বা পূর্ব ভারতীয় রেল নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়।

শুরুর সময় থেকেই EIR এর কাজ অবশ্য ঢিমেতালে এগোচ্ছিল। এবং শুরুতে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছিলো তাও স্তিমিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন কাগজে এবং জন-মানসে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছিলো। কিন্তু ১৮৫৩তে বোম্বাইয়ে রেলের সূচনা হবার সাথে সাথে ইংল্যান্ড ও ভারতের সমস্ত সংবাদমাধ্যম EIR এর ওপর জমে থাকা বিরক্তি উগড়ে দিতে আরম্ভ করে। চোখা বিশেষণ এবং বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক উক্তিতে পূর্ব ভারতীয় রেল কোম্পানিকে তারা নিয়মিত ভর্ৎসনা করতে থাকে। তার মধ্যে কাউকে এও বলতে দেখা যায় যে স্বয়ং রানী ভিক্টোরিয়া যদি EIR এর কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতেন তাহলেই হয়তো এই জগদ্দল পাথরকে নড়ানো সম্ভব হবে। কেউ আবার লিখলেন যে ১৮৪৫ থেকে শুরু করে গত আটবছরে EIR এর অগ্রগতি দেখবার মত। তারা হাওড়া থেকে রাজমহল (রানীগিঞ্জ) অবধি বাংলার সমতলভূমির ওপর দিয়ে রেললাইন পাততে আরো আটবছর সময় চেয়েছে। অর্থাৎ ২০০ মাইল লাইন পাততে এদের ১৬ বছর সময় চাই। এই অপদার্থতা ইংল্যান্ডের সিংহাসনকে অপমান করেছে। আরেকটি সংবাদ প্রতিবেদনের নির্যাস ছিল যে ১৮৫৬ সালের আগে কোনমতেই EIR বর্ধমান অবধি পৌছতে পারবে না। এটাও অভিযোগ করা হয়েছিল যে গঙ্গায় চলা বিভিন্ন স্টিমার কোম্পানিগুলির ব্যবসা সচল রাখার তাগিদেই এই রেল প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে বিলম্ব করা হচ্ছে। যদিও অন্যদিকে এটাও মনে করা হতো, যে রেলপথে হাওড়া থেকে রানীগিঞ্জ অবধি যোগাযোগ সম্পন্ন হলে তাতে আখেরে স্টিমার কোম্পানিগুলির লাভই হবে কারণ তাতে করে এলাহাবাদ অবধি বানিজ্যপথ আরো সুগম হবে।

মজার ব্যাপার হলো যে তৎকালীন ইংল্যান্ডে ৭০ মাইল (১১২ কিমি) লম্বা একটি রেলপথ

নির্মাণই বেশ বড়সর ব্যাপার বলে গন্য করা হতো। এবং সমগ্র ব্রিটেন জুড়ে কোথাও হাওড়া থেকে রানীগিঞ্জের মত ২০০ মাইল (৩২১ কিমি) বিস্তৃত রেলপথ ছিল না। কাজেই এহেন সমালোচনা ব্রিটিশদের কাছ থেকে আসার অর্থ বোধগম্য হয় না।

ভারতে তুলনায় অনেক সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যেত। কিন্তু কোম্পানির কাছে অজস্র নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-নয়নাজুলি অধ্যুষিত বাংলার নরম মাটির ওপর দিয়ে লাইন টেনে নিয়ে যাওয়াই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া ভালো রাজমিস্ত্রীর কাজ জানা শ্রমিকের অভাবও খুব ভুগিয়েছিল। এছারাও তৎকালীন আমেরিকায় হঠাৎ করেই চাহিদা বাড়ার ফলে লোহার দর আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিল। তার সাথে পন্যপরিবহনের মাশুল চড়া হারে বাড়তে লেগেছিল। যার দরুন প্রকল্পের খরচ প্রায় দ্বিগুণে গিয়ে ঠেকছিল।

১৮৫৩ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ মাইল (২৪ কিমি) রেলপথ পাতা হয়ে গেছিল। এবং আগামী শীতের মধ্যে হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়ো, হুগলী হয়ে ব্যান্ডেল অবধি প্রথম ২৫ মাইল (৪১ কিমি) রেলপথ সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। এই মর্মে চারটি যাত্রিবহনযোগ্য রেল ইঞ্জিন এবং তার যন্ত্রাংশ সমুদ্রপথে ইংল্যান্ড থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। একই সঙ্গে বেশ কিছু যাত্রীবাহী কামরা সহ আরেকটি জাহাজ একই সময় ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করেছিল।

এরপরেই দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, যার কারণে পুরো প্রকল্প বিরাট ধাক্কা খায়। 'Dekagree' নামের যে জাহাজটি বাস্পচালিত ইঞ্জিনগুলি নিয়ে ভারতে আসছিল সেটি পথ ভুল করে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়। ওপরদিকে যাত্রী কামরা নিয়ে Goodwin নামের জাহাজটির কেদগিরি বন্দর সলগ্ন খাঁড়িতে ভরাডুবি হয়। এই ঘটনার পরে, আবার নতুন করে ইংল্যান্ড থেকে কামরা আনানোর পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। EIR এর তৎকালীন মুখ্য লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার, মি. জন হজসন, ট্রেনের কামরাগুলি ভারতেই বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতার সিটন কোম্পানি আর স্টুয়ার্ড এন্ড কোম্পানি কে যৌথভাবে এই কাজের বরাত দেন।

এইরকম নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যেও EIR এর ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু নেপথ্যে থেকে দিনরাত এক করে কাজ চালিয়ে যান এবং ১৮৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে হাওড়া থেকে পান্ডুয়া অবধি ৪২ মাইল (প্রায় ৬৮ কিমি) রেলপথ তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হন। এরপর ছিল রেল ইঞ্জিনগুলি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা। সেইসময়ের একটি রিপোর্টে জানা যায় যে হুগলীর পরে বর্ধমান অবধি রেলপথের কাজের অগ্রগতি খুব দ্রুত না হলেও আশাব্যঞ্জক গতিতে চলছে। যদিও বেশ কিছু সেতুর থাম বসানোর গাঁথনিটুকু সবে তৈরি হয়েছে। এবং আগামী বর্ষার আগে বর্ধমান সেতুর কাজ শেষ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যদিও সেখানে প্রায় শতাধিক শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি মিলে নাগাড়ে পরিশ্রম করে চলেছে।

১৮৫৪ সালের মে মাসের গোড়ায় রেলইঞ্জিন সহ জাহাজটি অস্ট্রেলিয়া থেকে অবশেষে কলকাতায় এসে পৌছয়। কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করে ছিল আরেক বিপত্তি। EIR এর

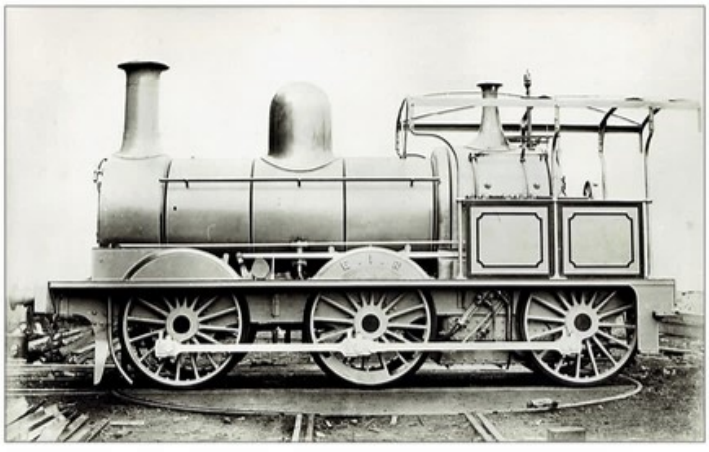

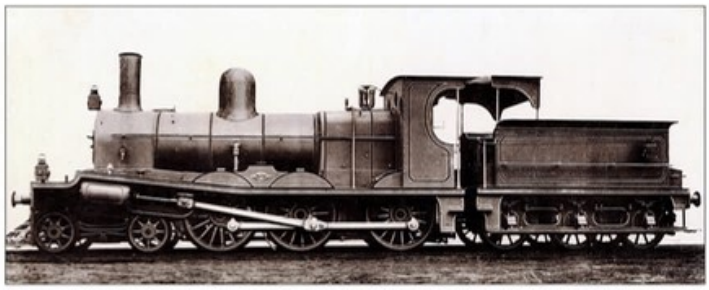

আধিকারিকদের কাছে জাহাজ থেকে টেন্ডার সহ ইঞ্জিনগুলিকে সুষ্ঠ ভাবে নামিয়ে আনার ব্যাপারে কোনরকম প্রস্তুতি ছিল না। তখনকার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁদের বক্তব্য ছিল যে তাঁরা নাকি এটা ভেবেই দেখেন নি। এবং কবের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হবে সেই বিষয়েও তাঁদের কোন ধারনা ছিল না। এবং প্রায় পনেরো দিন মতো সেই জাহাজ, নিষ্কর্মার মত বন্দরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে মাল নিয়ে।

এটি দেখবার বিষয় ছিল যে EIR ইঞ্জিনিয়াররা এবং কলকাতা বন্দরের আধিকারিকরা ঠিক কোন উপায়ে, ২৫০০ পাউন্ড মুল্যের ও বিরাট ওজনের এক একটি বাস্পচালিত ইঞ্জিনকে, কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে ডাঙায় নামাতে পারেন। প্রথমেই একটি বিরাট কাঠের ভেলা বানানো হলো। তারপর জাহাজের ডেকের ওপর দুটি বৃহদাকার কাঁচির মত দেখতে মানব-চালিত কাঠ এবং দড়ির সাহায্যে ক্রেন বানানো হলো। তার মধ্যে একটি ভেলার দিক করে, অপরটি জাহাজের খোলের দিক করে। ইঞ্জিনগুলি খোলের ভেতরে রেল লাইনের ওপর চাকা লাগানো পাটাতনের ওপর বসানো ছিল যাতে সহজেই এদিক ওদিক করা সম্ভব হয়। এরপর একটি ক্রেন দিয়ে ইঞ্জিনগুলি এক এক করে তুলে ডেকের ওপর রাখা হলো এবং আরেকটি ক্রেনের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে ডেকের থেকে ভেলায় নামানো হলো। এই দৃশ্য দেখার জন্য প্রতিদিন হাওড়া জেটিতে প্রায় হাজার খানেক মানুষের সমাগম হতো। এই পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হতে প্রায় একমাসের ওপর লেগে যায়।

প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে একটি কথার প্রচলন আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি গাড়ী পথে না নামছে ততক্ষন অবধি সাধারন মানুষের তার থেকে কোন প্রত্যাশা থাকে না। তাই বহু কষ্ট করে ইঞ্জিনগুলি নামানোর প্রক্রিয়া শেষ হতেই পরের কাজে হাত লাগানোর বিশেষ তাগিদ ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন মুখ্য লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার, মি. জন হজসন। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি ইঞ্জিনগুলির বিভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করে জোড়া লাগানো (assemble) এবং সেগুলিকে পথে নামানোর উপযোগী করে তোলার (commissioning) কাজে নেমে পড়েন। অ্যাসেম্বলিং এর কাজ প্রযুক্তিগত ভাবে এক প্রকার দুঃসাধ্য কাজের মধ্যে পরে। একটি ইঞ্জিনের চাকার পরীক্ষা করা, বয়েলারের ক্ষমতা নিরীক্ষণ করা, সমস্ত নাট-বল্টু শক্ত করে আটকানো, টিউবগুলিকে পালিশ করা ইত্যাদি হাজারো কাজ ত্রুটিহীন ভাবে সম্পন্ন করতে EIR এর ইঞ্জিনিয়ার, লোকো ইনস্পেক্টর, ফোরম্যান প্রভৃতি দিন রাত এক করে লেগে থাকতেন। ইতিমধ্যে কলকাতার দুটি কোম্পানির থেকে কামরা তৈরি হয়ে আসাও শুরু হয়। মূলত তিন ধরনের কামরার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য। এবং ১৮৫৪ সালের জুন মাসের শেষের দিক থেকে অল্প অল্প করে তিন ধরনের কামরাই EIR হাতে পেতে শুরু করে।

অবশেষে সেই দিনক্ষণ আসে যার জন্যে বহু মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ২৯শে জুন ১৮৫৪ হাওড়া থেকে একটি ইঞ্জিনের পান্ডুয়া অবধি পরীক্ষামূলক দৌড়ের দিন স্থির হয়। হাওড়া শেডের মেকানিকদের দৌলতে এই কথা রাষ্ট্র হতে মোটেই সময় লাগেনি। যারফলে সেই দিন সকাল থেকে লাইনের পাশে প্রচুর জনসমাগম দেখা দেয়। হাওড়াতেও গোটা স্টেশন এলাকা জুড়ে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বহু উৎসাহী মানুষের ভিড় দেখা দেয়। তারা সবাই, আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির দুত, সেই লৌহদানবের

সময়কে ভেদ করে এগিয়ে যাবার ঘটনার সাক্ষী থাকতে চায়। যথাসময়, পূর্ব ভারতে সেই প্রথমবার, রেলের চাকা গড়ালো। ইঞ্জিনটি সেদিন প্রায় ৪০ মাইল (৬৫ কিমি) প্রতি ঘন্টা গতিতে পান্ডুয়া যাতায়াত করে। এবং সেটির ফিরতে ফিরতে একটার জায়গায় প্রায় তিনটে বেজেছিল কারণ টিফিনের সময় হয়ে যাওয়াতে চালকেরা খেতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছিল। সেটি পুনরায় যখন হাওড়া ফেরে, সেখানে উপস্থিত অপেক্ষারত জনতা সোল্লাসে করতালি দিতে দিতে তাকে স্বাগত জানায়।

এরপরে EIR কর্তাদের একটাই কাজ করার বাকি ছিল, তা হলো বিভিন্ন শ্রেণীর টিকিটের মূল্য এবং পণ্য মাসুল ধার্য করা। যাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রেল পরিষেবা শুরু করে দেওয়া যায়। সেটা করার সাথে সাথে আরো ৭০টি ইঞ্জিন ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা এবং ১০০টি বিভিন্ন শ্রেণীর কোচ বানানোর অর্ডার দেওয়া হয়।

সাধারন যাত্রী পরিষেবা চালু করার আগে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জুলাই মাসের ৬ তারিখ পরীক্ষামূলক যাত্রার দিন হিসেবে ঠিক করা হয়। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সপরিবার আমন্ত্রন জানানো হয় রেল ভ্রমণের জন্য। বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মূলত যারা পণ্য সরবরাহের সাথে যুক্ত, তার কর্ণধারদেরকেও আমন্ত্রন জানানো হয়। নির্দিষ্ট দিনে গতবারের মত এবারও ভোর বেলা থেকেই অগনিত দর্শনার্থীর ভিড় আছড়ে পরে হাওড়া স্টেশনে। লঞ্চে করে লোক বোঝাই হয়ে এপারে আসতে থাকে। ওপারে স্ট্র্যান্ড রোডে মানুষ আর গাড়ী ঘোড়ার জটে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ হিমশিম খেতে থাকে। এদিকে এই ভিড়ের কারণে নিমন্ত্রিতদের আসতেও দেরি হয়ে যায়। ফলে ট্রেন ছাড়তেও দেরি হতে থাকে। এদিকে একটি মজাদার ব্যাপারও ঘটেছিল। হাওড়াতে উপস্থিত জনতার ভিড়ের একাংশ ট্রেন যে আদৌ চলবে এটা বিশ্বাস করতে ততক্ষন অবধি নিমরাজি ছিল যতক্ষণ না ইঞ্জিনের হুইসেল শোনা যায় এবং ট্রেন নড়ে ওঠে। তাদের ধারনা ছিল যে ট্রেন ছাড়া নিয়ে একটা নিতান্তই বাজে গুজবের শিকার হয়েছে তারা।

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ অবশেষে পরিস্থিতি অনুকূল হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটিমাত্র কামরাবিশিষ্ট ট্রেনটি সকাল আটটা বেজে আট মিনিটে হাওড়া ছাড়ে, উপস্থিত হাজারো মানুষের প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে। লাইনের ধারে ধারেও বহু মানুষ ভিড় করে থাকে প্রথম ট্রেন যাবার দৃশ্য দেখার জন্যে। চন্দননগর, শ্রীরামপুর, পান্ডুয়া সব জায়গাতেই একই দৃশ্য দেখা যায়।

ট্রেনটি বালিখাল পৌছয় ৯ মিনিটে; ২৩ মিনিট সময় নেয় শ্রীরামপুর পৌছতে; ৪৬ মিনিটে পৌছয় চন্দননগর; ৫০ মিনিটের মাথায় পৌছয় হুগলীতে; যেখান থেকে আরো ২৮ মিনিট নেয় পান্ডুয়া অবধি যেতে। সেখানে মাননীয় যাত্রীদেরকে গরম চা-জলখাবার পরিবেশন করা হয়। দুপুর একটার মধ্যে ট্রেন আবার হাওড়ায় ফেরত আসে উচ্ছসিত যাত্রীদের নিয়ে। প্রতিটি যাত্রীই EIR এর ব্যবস্থাপনাকে নিখুঁত বলে আখ্যা দেন। বিশেষত সুন্দর করে নির্মিত স্টেশন-বাড়িগুলো তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গোটা লাইন জুড়ে দু-একটা গরু-ছাগল বাদ দিলে সাধারন জনতাকে লাইনের থেকে দুরেই থাকতে দেখা গেছে। এবং হাওড়া কাছে একটি লেভেল ক্রসিং এর গেট ভুলবশত খুলে যাওয়ায় সেটি ইঞ্জিনের ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায়।

এরপরেই কোম্পানি সাধারন যাত্রীদের জন্য রেল পরিষেবা চালু করতে উঠে পড়ে লাগে। প্রাথমিক ভাবে এটা ঠিক ছিল যে ১৮৫৫র পয়লা জানুরারির মধ্যে রানীগঞ্জ অবধি লাইনের কাজ শেষ হলে তবেই সাধারন যাত্রীবাহী রেল চালানো শুরু করা হবে। কারণ তাতে করে রাজধানির সাথে বর্ধমানের কোলিয়ারি গুলোর সংযোগ স্থাপন হবে। এবং পণ্যপরিবহনে গতি আসবে। কিন্তু তার আগেই পান্ডুয়া রেল সংযোগের সাফল্যে কোম্পানি উৎসাহী হয়ে ওঠে। এবং ১৫ই জুলাই এর মধ্যে হুগলী অবধি নিয়মিত ট্রেন চালানোর ভাবনা চিন্তা শুরু করে। কিন্তু শেষ মুহূর্তের নানা প্রস্তুতিতে তা এক মাস পিছিয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয় যে দুটো ট্রেন চালানো হবে। পরিস্থিতি বিচার করে পরে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। হাওড়া থেকে হগলী অবধি প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের মূল্য ধার্য করা হয় যথাক্রমে ৩ টাকা, ১ টাকা এবং ৬ আনা। এটাও ঠিক হয় যে ট্রেন মোট ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটে পুরো পথ অতিক্রম করবে। পরে পান্ডুয়া অবধি লাইন চালু হলে যা বেড়ে দাঁড়াবে ১ ঘন্টা ৫০ মিনিটে।

এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার শেষে, ১৫ই আগস্ট ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে প্রথম সাধারন যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের থেকে প্রায় ৩০০০টি আবেদনপত্র জমা পরে এইমর্মে, যে তারা প্রথম আনুষ্ঠানিক রেলযাত্রার শরিক হতে চায়। যা কিনা গোটা ট্রেনের সিটের সংখ্যার দশগুণ। প্রথম ট্রেনটিতে তিনটি প্রথম শ্রেণী, দুটো দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তিনটে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা সাথে একটা গার্ড কামরাসহ সবসুদ্ধ ৯টা কামরা ছিল। প্রতিটি কামরা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে আটটায় হাওড়া ছেড়ে ট্রেনটি ৯০ মিনিটে হুগলী পৌছয়। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষণীয় যে এইবার রেল চালুর সময় কোনোরকম উৎসব পালন করা হয়েনি। যা কিনা ইংরেজদের প্রথাগত চিন্তার পরিপন্থী। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে স্বয়ং লর্ড ডালহৌসি নাকি EIR রের অত্যধিক দেরী নিয়ে তিতিবিরক্ত ছিলেন। ফলে কারোরই এই নিয়ে হইচই করা সাহসে কুলায় নি।

এদিকে রেল চালু হবার পর থেকেই যাত্রী সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে থাকে। দিনের প্রতিটি ট্রেনের প্রতিটি কামরা যাত্রীতে পরিপূর্ণ থাকতে আরম্ভ করে। এবং সেপ্টেম্বরে হুগলী থেকে পান্ডুয়া অবধি লাইন খুলে দিতেই যাত্রী সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যায়। এবং তারপর থেকে ক্রমাগত বেড়েই চলে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম ১৬-সপ্তাহেই EIR মোট ১০৯,৬৩৪ জন যাত্রীকে বহন করে ফেলেছে। যারমধ্যে ৮৩,১১৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ২১,০০৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং ৫৫১১ জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। মোট ৬৭৯৩ পাউন্ড মুল্যের টিকিট বিক্রি হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান সব প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

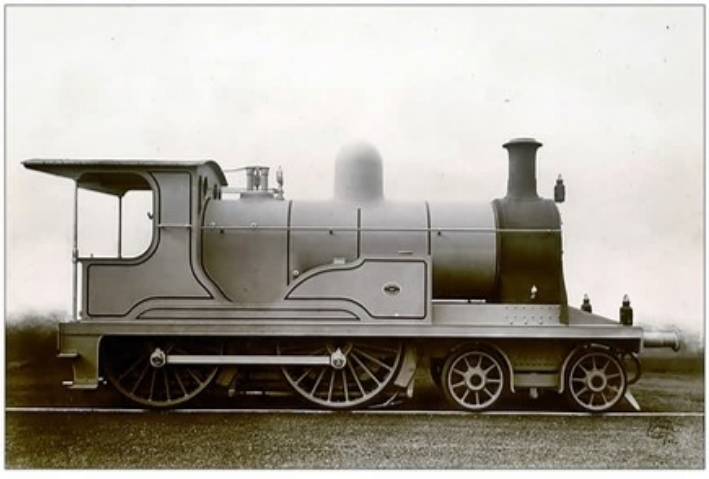

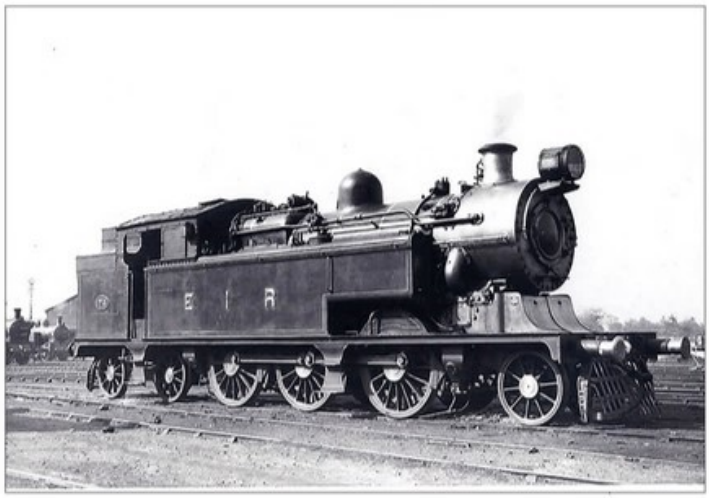

যদিও এই লাইন চালুর ব্যাপারে গোড়ায় বহু নেতিবাচক কথাও বলা হয়েছিল। যারমধ্যে একটি যুক্তি ছিল যে ইংরেজ শাসকদের হাতে নিপীড়িত একটি জাতির থেকে এই রেলের কিছু পাওয়ার নেই। সাধারন মানুষের কাছে এই রেল গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কারণ তারা এটাকে ইংরেজদের শাসন যন্ত্রের একটি নতুন দিক ভেবে আতঙ্কিত হয়ে প্রত্যাখান করবে। তাছাড়া ভারতীয়রা প্রচন্ড একগুঁয়ে জাতি, তারা সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের পূর্বপুরুষের দেখানো পথই কেবলমাত্র অনুসরণ করতে অভ্যস্ত। তাদেরকে এই রেল সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলা জগদ্দল পাথর সরানোর মত কঠিন কাজ। বরং রেল কোম্পানি যদি পণ্য পরিবহনে বেশি মনোযোগ দেয় তাহলেই একমাত্র লাভের মুখ দেখতে পারে। তাছাড়াও এটাও বলা হয়েছিল যে রেল কলকাতার শহরতলি থেকে শুরু হচ্ছে এবং মাইলের পর মাইল শুধু মাত্র কিছু হতদরিদ্র গ্রাম, কিছু নিম্নমধ্যবিত্ত মফঃস্বল এবং মাত্র তিনটি উল্লেখযোগ্য ছোট শহর ছুঁয়ে গিয়ে একটা পাণ্ডববর্জিত এলাকায় গিয়ে শেষ হচ্ছে তাতে কিভাবে যাত্রী হতে পারে। সর্বোপরি আবার এই লাইন বেশ কিছুদুর গঙ্গা বরাবর ওপরে উঠেছে। যারফলে দ্রুতগতির স্টিমার কোম্পানিগুলির সাথে যাত্রি টানার নিরিখেও এই রেল যোজন পিছিয়ে থাকবে। এমনকি এও বলা হয়েছিল যে, ট্রেনগুলিতে সপ্তাহান্তে যাত্রী সমাগম হতে পারে, কারণ শনিবার হাফবেলা ব্যাবসা বন্ধ রেখে, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার মালিক বা আধিকারিকরা হয়তো ফরাসিদের চন্দননগরে, বা ডাচ্‌দের চুঁচুড়াতে অথবা পর্তুগিজদের ব্যান্ডেলে সপরিবারে আমোদ ভ্রমণে বেরোতে পারেন।

কিন্তু এই সমস্ত তত্ত্বকথা ভুল প্রমানিত হয়। বাঙালিরা পূর্ব ভারতীয় রেলকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হিসেবে মহা উৎসাহে গ্রহণ করে। সমস্ত আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে প্রথম দিন থেকে রেল তাদের পছন্দের পরিবহণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। আগে উল্লেখিত পরিসংখ্যানেই তার প্রমান পাওয়া যায়। যদিও অধিকাংশ স্টেশনেই ন্যূনতম যাত্রী পরিষেবার বালাই ছিল না, পর্যাপ্ত যাত্রিবহন যোগ্য ইঞ্জিন ছিল না, খারাপ হলে সময়ের মধ্যে সারিয়ে তোলার ইঞ্জিনিয়ার অপ্রতুল ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় যাত্রী কামরার অভাব স্পষ্ট ছিল, বেশীরভাগ তৃতীয় শ্রেণীর কামরা কিছুদিন চলার পরেই মানুষ যাবার অযোগ্য হয়ে উঠতো, এবং তখনও অবধি রেল কর্মীদের অনেকাংশের কাছে নিজের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনাও ছিল না, এছাড়াও দেরিতে ট্রেন চলা, রেল আধিকারিকদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ইত্যাদি তো ছিলই। এতরকম অভাব অভিযোগ, শত অসুবিধা সত্ত্বেও সাধারন যাত্রীদের তা নিয়ে বিশেষ হেলদোল ছিল না। বরং এই সমস্ত সমস্যাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই তারা যথেষ্ট সংখ্যায় রেলে চড়তে থাকে। এবং ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, গতি দিয়ে সময়কে পরাজিত করবার এই লৌহদানবকে তারা স্ত্রী-পুরুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে এসেছে বরাবর।

লেখক শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র পেশাগত ভাবে একজন রেল আধিকারিক এবং বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের অতিরিক্ত মহাকর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। তাঁর নানাবিধ শখের মধ্যে অন্যতম হলো রেলের জানা-অজানা নানান ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যসমূহ খুঁজে তা লিপিবদ্ধ করা। এবং মূলতঃ তিনি পূর্ব ভারতীয় রেলের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে এবং জানাতে আগ্রহী। রেল ক্যানভাস পরিবারের তরফ থেকে তাঁর এই অসাধারন কাজে আমাদেরকে শরিক করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুবাদক - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী। *প্রচ্ছদ চিত্র - সোমশুভ্র দাস।*

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ Historical Railway Images (Flickr), British Library Website

ছবিটি CTUA দ্বারা প্রেরিত
স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত

কলকাতার ট্রাম চরিত

- রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

"এই যে দেখছো ট্রামগাড়ী, এর বয়স জানো কত?" ধর্মতলাগামী একটা ট্রামকে দেখিয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট বা অধুনা বিধান সরণির ওপর একটা চায়ের দোকানে বসে প্রশ্নটা করলেন হাবুদা। সময়টা তখন ২০১৫ সাল। গ্রামের বাড়ি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করতে কলকাতায় এসে ইস্তক পড়াশোনার ফাঁকে বিশেষ কিছু দেখবার বা জানবার সুযোগ হয়নি বললেই চলে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সুযোগ পেয়ে যত ভালো লেগেছিলো, ততটাই ভালো লেগেছিলো নতুন কিছু মানুষের সাথে আলাপ করে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য আমার মেসের রুমমেট কল্যাণ এবং অনীশ আর অবশ্যই হাবুদা। হাবুদার সাথে পরিচয় ট্রামে। কলকাতায় এসে যেটা প্রথম করেছিলাম, যে দুই নতুন বন্ধুর সাথে একইদিনে ট্রাম এবং পাতালরেল চড়া। এবং সেইদিনই দেখা হাবুদার সাথে। আমাদের প্রথম ট্রামে চাপার উত্তেজনা লক্ষ্য করে যেচে আলাপ করেন। পরিচিতি অন্ধকার। শুধু জানি যে থাকেন হাতিবাগানে কোথাও। কট্টর মোহনবাগান সাপোর্টার এবং পুরোনো কলকাতার অনুরাগী। চটরাগী লোক, কিন্তু খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসেন। ওনার সাথে মাঝে মাঝেই দেখা হতো কলেজের সামনে বা আশেপাশে কোথাও। কখনো নিজেই ফোন করে ডেকে নিতেন। তারপর জমতো আড্ডা। উনি খুলে বসতেন গল্পের ভান্ডার। সাথে থাকতো চা আর উত্তর কলকাতার বিখ্যাত সব তেলেভাজা বা অন্য টুকিটাকি। আজ তেমনই এক বিকেল। ক্লাসের পর কল্যাণের মোবাইলে ফরমান এলো হাজিরা দেবার। ইতিমধ্যেই আগের কয়েকটা আড্ডায় পুরনো কলকাতার দারুণ কিছু গল্প শুনে ফেলেছি। সমবয়সি না হলেও একটা অদ্ভুত হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁর সাথে। এবং তাঁর গল্পগুলো থাকত তথ্য এবং সত্যি ঘটনায় পরিপূর্ণ।

"বলতে পারলে নাতো!" ফের বললেন হাবুদা।

"না দাদা পটলা জানে না। আপনিই বলুন।" অনীশটা ফুট কাটলো।

"তুই জানিস তো তুই বল দেখি, পটলা জানে না মানে কি"- তেড়িয়া জবাব আমার।

"আচ্ছা আচ্ছা ঝগড়া পরে আগে শোনো।" কলহের সূত্রপাত হতে দেখে বাধা দেন হাবুদা। এরপর চায়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে ডালের বড়াতে একটা রাম কামড় বসিয়ে শুরু করলেন তার গপ্পো। "১৮৭০ সাল নাগাদ বুঝলে, সাহেবদের হঠাৎ মাথায় এলো যে শিয়ালদা স্টেশন আর গঙ্গার তীরে অবস্থিত বন্দর সংলগ্ন মাল গুদামগুলির মধ্যে মালবহন করার জন্য ট্রামলাইন পাতলে মাল নিয়ে আসা যাওয়ায় সুবিধে হতে পারে। বন্দর মানে আবার তোমরা এখনকার খিদিরপুর বন্দর ভেবোনা যেন। তখন নাব্যতা বেশি থাকার দৌলতে আর্মেনিয়ান ঘাটের কাছেও জাহাজ ভিরতো। যাক যা বলছিলাম। দেখে থাকবে যে হাওড়া ব্রিজের এদিকে স্ট্র্যান্ড রোড থেকে শুরু করে ওদিকে পোস্তা অবধি লাইন দিয়ে গঙ্গার ধার বরাবর বেশ কিছু প্রকাণ্ড মালগুদাম আছে যাকে warehouse বলি। তাদের বিভিন্ন নামও আছে। তারমধ্যে স্ট্র্যান্ড হাউসটা অবশ্য বিধ্বংসী আগুনে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়াও ওই এলাকা বরাবর প্রচুর দোকানপাট, হাট বাজার ইত্যাদির জন্যেও এই লাইন কার্যকরী হতে পারে। ইংরেজদের যেমন ভাবা তেমন কাজ। লাইন পাতা শুরু হলো। তারপর ১৮৭৩ সালে আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে শিয়ালদা অবধি প্রথম ঘোড়ায়টানা মালবাহী ট্রাম চালু হলো।"

"ট্রামে মানুষ যেত না?" আলটপকা অবাক প্রশ্ন কল্যাণের।

"সেকথাতেই আসছি হে।" ডালের বড়া শেষ করে বেগুনির দিকে হাত বাড়ালেন হাবুদা।

"যাত্রিবহনের ব্যাপারটা কিন্তু গোড়াতে সাহেবদের মাথাতেই ছিল না। শিয়ালদা স্টেশনে যে সব শস্য বা পণ্য আসতো সেগুলো নদীর ধার পর্যন্ত নিয়ে যাবার ভরসা একমাত্র ছিল গরুর গাড়ি। কারণ তখনো পর্যন্ত মোটরগাড়ির প্রচলন হয়নি কলকাতায়। ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল যে শিয়ালদা থেকে পশ্চিমে গঙ্গার ধার অবধি একটা, আর দক্ষিণে ভবানীপুর অবধি আরেকটা লাইন পাততে। একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল যারা এই ট্রাম লাইন পাতার দায়িত্বে ছিল। কমিটির একটা প্রস্তাব দিল যে শিয়ালদা থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট, লেবুতলা বৌবাজার হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট অবধি একটা লাইন আরো উত্তরে চিৎপুর ব্রিজ অবধি টেনে দেবার। কিন্তু তৎকালীন বাংলা প্রদেশের সরকার এই প্রস্তাবের আংশিক গ্রহণ করে। এবং শুধু আর্মেনিয়ান ঘাট অবধি লাইন পাতারই অনুমতি দেয়। তখনকার দিনে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচা হয়েছিল এই লাইন পাততে।"

"দেড় লাখ!!!" হতবুদ্ধি হয় যৌথ প্রশ্ন আমাদের।

"এটুকুতেই অবাক হলে ছোকরারা। এত সবে শুরু। যাক যা বলছিলাম।" বেগুনীটা শেষ করে এক চুমুকে বাকি চা টা খতম করে বলে চলেন হাবুদা। "তো মোটামুটি বুঝলে, ১৮৭১'এ শুরু করে ১৮৭৩'এর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে লাইন পাতার কাজ শেষ হলো। এবং ওই মাসেরই ২৪ তারিখ এই শহরের ইতিহাসের অন্যতম একটি অধ্যায়ের সুচনা হলো। কলকাতা পেলো তার প্রথম ট্রাম। তিনটি ট্রাম গাড়ী দিয়ে এই লাইনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রতিটি গাড়ী জন্য ছিল দুটি করে ঘোড়া।"

"মাল টানাটানি করার এই নতুন বুদ্ধিটা তারা বার করেছিল ভালোই কিন্তু ধোপে টিকলো না। তাই সেই বছরেই নভেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে গেলো ওই লাইন।"

"যাহ, তাহলে?" আচমকা আমার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেড়িয়ে এলো।

"আরে বলছি শোনোই না" বিরক্ত হলেন হাবুদা। "এর প্রধান কারণ ছিল কি, তা জানলে অবাক হবে। কারণ ছিল যাত্রী পরিবহন।"

"অ্যাঁ!!!"

"অ্যাঁ নয় হ্যাঁ", বলে চলেন হাবুদা, "মাল পরিবহন করার বদলে যাত্রী নিয়ে চলাই ছিল এই ট্রাম লাইনের লোকসানের মূল কারণ। জানা যায় যে নাকি প্রায় ৫০০/- টাকা প্রতি মাসে লোকসান গুনতে হচ্ছিল। এবং তাই ডিসেম্বর মাসে তিনটি ট্রাম গাড়িও বেচে দেওয়া হয়।"

"কিন্তু -!!!" আবার আমি।

বাধা দিয়ে বলে চলেন হাবুদা, "কিন্তু হলো যে, তারপরও ট্রাম ফিরে কি করে এলো তাইতো। হু হু, বাবা!! এরা ছিল সাহেবদের জাত। অল্পে ছাড়ে না। পাঁচ বছর পরের কথা, লন্ডন থেকে Alfred Parrish সাহেব আর লিভারপুল থেকে Robinson Souttar সাহেব মিলে একটা নতুন প্ল্যান বানালো গোটা কলকাতায় যাত্রীবহনকারি ট্রাম চালু করার জন্য। ১৮৭৯ সালে তারা কলকাতা কর্পোরেশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো আর কলকাতা ট্রামওয়ে আইন পাশ হলো ১৮৮০ সালে। একই বছর পয়লা নভেম্বর কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে যাত্রীবাহী ট্রাম চলা আরম্ভ হলো এবং তারপর ঐবছরেই এলো সেই ঐতিহাসিক দিন - ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮০ যেদিন লন্ডনে নথিভুক্ত হলো CTC যাকে আমরা ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি লিমিটেড বলে জানি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রাম প্রথমে চালু হলো শিয়ালদা আর ডালহৌসির মধ্যে। লেবুতলা, বৌবাজার, লালবাজার হয়ে সেই পুরোনো রুটেই লাইন পাতা হলো কিন্তু এবার আর গঙ্গার ধারে গেলো না। প্রথম প্রথম ডালহৌসিতেই শেষ হতো এই রুট। পরে ১৮৮১ তে লালবাজার থেকে চিৎপুর রোড হয়ে একটা লাইন তৈরি হলো উত্তরে যেটা শোভাবাজার ছাড়িয়ে কুমোরটুলিতে গিয়ে শেষ হলো এবং দক্ষিণে চৌরঙ্গী হয়ে কালীঘাট অবধি আরেকটা লাইন পাতা হলো। আগের বারের মত এবারও ঘোড়ায় টানা ট্রামই চালু হলো। কিন্তু রেল গাড়ির মত কয়লার ইঞ্জিনেরও ব্যাবহার হয়েছিল।"

অনীশ সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "ট্রেনের কয়লার ইঞ্জিন শুনেছি। কিন্তু ট্রামেরও ??? কিরকম অদ্ভুত শোনাচ্ছে যেন ?

"আমি কি গালগল্প বলছি মনে হচ্ছে?" রেগেই গেলেন হাবুদা। "তোমাদের মত ডেঁপো ছেলে ছোকরাদের এই এক দোষ। নিজেরা কিছু জানো না, আবার জানাতে গেলে উল্টে তর্ক করো। তোমরা নিজেরাই বকতে থাকো তাহলে, আমি হাঁটা দিলাম।"

দেখলাম সমূহ বিপদ। ভালো গল্পের মশলা হাতছাড়া হতে চলেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল অনিষ্টকারী অনীশটাকে এক চাঁটি মারি কিন্তু ব্যাটা আবার স্কুলে ক্যারাটে শিখেছে তাই মনের রাগ অতিকষ্টে চেপে রেখে হাবুদাকে গিয়ে ভজাতে লাগলাম। বললাম " ছাড়েন না ওর কথা। রাগ না করে চলুন দাদা একটু Paramount এ ডাবের সরবত খাওয়া যাক।" এই ডোজে কাজ হলো। সবাই মিলে হাঁটা লাগালাম।

"শুধু ট্রেন চলবে কয়লার ইঞ্জিনে, ট্রাম চালানো যাবে না, সেটা কোথায় লেখা আছে?"

ধর্মতলায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত

বড়সড় একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন হাবুদা।

অনীশ যেন শুনতেই পায়নি এরকম ভাবে সরবতে মনোনিবেশ করলো।

"শুধু পড়ার বইয়ে মুখ গুঁজে না বসে থেকে, সময় নিয়ে একটু চারপাশের খবর রাখতে শেখো। ধর্মতলায় তো মাঝে মাঝেই যাও শুনতে পাই। ট্রামে চড়েই যাও সেটাও জানি। কিন্তু ধর্মতলা ট্রাম গুমটিতে একটা পুরোনো ট্রামকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিউজিয়াম করে রাখা আছে সে খবর জানা আছে কারুর? ওই মিউজিয়ামের মধ্যে স্টীম ট্রাম এর একটা মিনিয়েচার রাখা আছে গিয়ে দেখে আসতে পারো।" ঠাণ্ডা সরবতের এফেক্ট শুরু হয়নি বোধহয় হাবুদার।

"এবার নিশ্চয়ই যাবো কিন্তু আপনি বলে যান" কল্যাণের উক্তি।

"হুঁ। যা বলছিলাম", অবশেষে শুরু করলেন হাবুদা, "সাহেবদের পরিকল্পনা ভালোই ছিল। রীতিমত সমীক্ষা করে মতামত নিয়ে চৌরঙ্গী রুটে স্টীম ট্রাম পরিষেবা শুরু করা হয়। কিন্তু কোনো অজানা কারণে এবং উপর্যুপরি দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ মাত্র এক বছর চলার পরই, স্টীম ইঞ্জিন গুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়।"

অনীশের মুখ দেখে ওর মনে ফের প্রশ্নের আনাগোনা দেখে কড়া চোখের ইশারায় দাবড়ানি দিলাম।

"তো যাইহোক, ট্রামের সম্প্রসারণ কিন্তু চলতেই থাকলো। এই যে ৫ নম্বর রুটের লাইন দেখছো এটা শুরু হয় ১৮৮২তে। একই বছরে ওয়েলিংটন, মৌলালি হয়ে লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে শিয়ালদা অবধি লাইন চালু হয়। শিয়ালদাকে তখন ট্রামের ঘাঁটি বলা হতো। ওদিকে ডালহৌসি থেকে একটা লাইন স্ট্র্যান্ড রোডে এসে বাঁদিকে হাইকোর্টে গিয়ে শেষ হলো আরেকটা লাইন ডানদিকে সোজা চলে গিয়ে স্ট্রান্ড ব্যাংক রোডে পড়ে নিমতলা ঘাটে শেষ হলো। প্রথম কিছু বছর মিটারগেজ লাইন দিয়ে এবং মূলত একটা লাইনেই ট্রাম চলতো। নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর লুপ করা ছিল আপ ডাউনের গাড়ী পাস করার জন্য। ১৮৮৫'র পরে, ভীড় বাড়ার দরুণ ডবল লাইন পাতা শুরু হলো। এর মধ্যে ১৮৮৩ সালে ময়দান হয়ে খিদিরপুর লাইন চালু করা হয় আর ১৮৮৪'র গোড়ায় ওয়েলিংটন হয়ে ডানদিকে একটা লাইন ওয়েলেসলী স্ট্রিট ধরে সোজা গিয়ে পড়লো পার্ক স্ট্রিটে। তারপর বাঁদিকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত গিয়ে শেষ হলো। এর দশ বছরের মধ্যে সিটিসির কাছে ট্রামগাড়ীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৬ সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক ঘোড়া। এই দিয়ে মোট আটটি রুটে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথে গাড়ী চালানো হতো। কিন্তু ঘোড়ার মূল সমস্যা ছিল কলকাতার মাত্রাতিরিক্ত গরম। বেচারা ঘোড়াগুলো বেশিরভাগই এই গরমে গাড়ী টেনে অল্পতেই থকে যেত। কাজেই সাহেবরা বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে বাধ্য হলো। এবং এরপরই ভাবনাচিন্তা শুরু হলো আধুনিক যুগের বৈদ্যুতিন ট্রাম নিয়ে।"

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন হাবুদা। বাকি সরবত টুকু শেষ করে বললেন, "চলো বাকিটা হাঁটতে হাঁটতে বলবো।" বিল মিটিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কলকাতায় ব্যবহৃত প্রথম বৈদ্যুতিন ট্রামগাড়ি — ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং মৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত

হাওড়ায় ব্যবহৃত দু-মুখি ট্রাম — ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং মৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত

বাকিটা হাঁটতে হাঁটতে বলবো।" বিল মিটিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

"১৮৯৬ সালে কিলবার্ন কোম্পানি প্রস্তাব দেয় যে কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামের বদলে ইলেকট্রিক ট্রাম চালু করা হোক। শহরের গণ্যমান্যদের নিয়ে সিটিসি একটা কমিটি গঠন করে প্রস্তাবটি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে। এবং ১৮৯৯ সালে কমিটি সায় দেয় বৈদ্যুতিন ট্রাম চালুর জন্য। এর জন্য দু বছরের সময়সীমা ধার্য করা হয়। এও সুপারিশ করা হয় যে সমস্ত লাইনগুলি বাকি বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ট্যান্ডার্ড গেজে রূপান্তরিত করা দরকার। এটা নিশ্চয়ই বুঝেছ যে দুবছরের ভেতরে ৩০ কিমি লাইন নতুন করে পাতা এবং বৈদ্যুতিকরন করা চাট্টিখানি কথা নয়। তখনকার সময় তো প্রায় অসম্ভব ছিল। তাও বিলেতের Dick Kerr অ্যান্ড কোম্পানি অত্যুৎসাহী হয়ে কাজের ইচ্ছে প্রকাশ করে এবং ১৯০০ সালে কন্ট্রাক্ট মারফত এই কাজে হাত দেয়। "

"দুবছরে কাজ শেষ করে দিলো?" - সিটি কলেজ ছাড়িয়ে এসে ফুটপাথে শুয়ে থাকা একটা কুকুরকে পাশ কাটাতে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতে প্রশ্নটা করলো কল্যাণ।

"না বাপু, ওরা সাহেব ছিল বটে তাই বলে অতিমানব ছিল না। তবে হ্যাঁ, ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওরা ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর লাইন কিন্তু পুরো কমপ্লিট করে দিলো। আর তাই আমাদের কল্লোলিনী তিলোত্তমা, এশিয়া মহাদেশের প্রথম শহর হিসেবে জায়গা করে নিল, যখন ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯০২ সালে কলকাতা তথা এশিয়ার প্রথম বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম চালু হলো ধর্মতলা আর খিদিরপুরের মধ্যে। এবং কিছুদিনের মধ্যে চৌরঙ্গী হয়ে কালীঘাট অবধি লাইনটাতেও বৈদ্যুতিকরনের কাজ শেষ হয়ে গেল।"

অনীশ বললো, "বুঝলাম, জানলাম, শিখলাম।

"হ্যাঁ, আজ যতটুকু বললাম তা আগে হজম করো বাকিটা অন্যদিন বলবো", এই বলে হাবুদা টুক করে একটা শ্যামবাজারগামী ট্রামে উঠে পড়লেন।

শনিবারের সন্ধ্যা। একটা খাসা কালবৈশাখী হয়ে গিয়ে চারিদিকে বেশ একটা ঠাণ্ডা ভাব। আমাদের আসর বসেছে আজ বাগবাজার মায়ের ঘাটে। জায়গাটা বড়ো ভাল। একধারে গঙ্গা, অন্যধারে ট্রেনলাই, তার ঠিক বাইরেই বেড়ার ওধারে ট্রাম লাইন।

"সেদিন যা বলেছিলাম, কিছু মনে আছে" ঝালমুড়ি চিবোতে চিবোতে অনীশের দিকে সরু চোখে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন হাবুদা।

"মবব্- আছে" মুড়ি ভর্তি মুখে উত্তর অনীশের।

"হুঁহ", নাকের মধ্যে একটা শব্দ করে হাবুদা বললেন, "তাহলে বলো দেখি কোন কোম্পানি ইলেকট্রিক ট্রামের সুচনা করেছিল কলকাতায়?"

"Dick & Kerr।" হাবুদা জানতেন না যে অনীশটা আবৃত্তি তে প্রাইজ পাওয়া ছেলে। ব্যাটার স্মৃতিশক্তি প্রখর।

"মনে আছে দেখছি" উত্তর পেয়ে খুশি হয়ে শুরু করলেন হাবুদা। "তো এই Dick Kerr অ্যান্ড কোম্পানি যে ইলেকট্রিক সিস্টেমটা আমদানি করে আনলো তা কিন্তু এখনো চলছে। ট্রামের চালকের কেবিনে যদি দেখতে পাও তাহলে কিছু ট্রামের কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর Dick Kerr System কথাটা দেখতে পেতে পার। তো যাইহোক, এই খিদিরপুর লাইনের সাফল্য বাকি রুটে গেজ পরিবর্তন ও বৈদ্যুতিকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করলো। রেকর্ড কালীন তৎপরতায় কাজ করে ১৯০২ সালেরই নভেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত রুটের কাজ শেষ হলো। কিন্তু ওই যে বলে না মুদ্রার এপিঠ যেমন আছে তেমনি ওপিঠও আছে। ঠিক তেমন ভাবেই এই বৈদ্যুতিকরণের হাত ধরে যেমন নতুন ট্রাম আমদানি হলো তেমনি প্রথমবার কলকাতার ট্রামে শ্রেণীবিন্যাস আরম্ভ হলো।

Dick Kerr সিস্টেম'এর কন্ট্রোলার — ছবি: রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

কলকাতার আরেক ধরনের বৈদ্যুতিন ট্রাম — ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং মৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত

কলকাতার J-শ্রেণীর এক কামরার ট্রাম   ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং বৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত

কলকাতার K-শ্রেণীর দু-কামরার ট্রাম   ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং বৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত

পুরোনো ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীগুলি, নতুন ইলেকট্রিক ট্রামের পেছনে দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে জুড়ে দেওয়া শুরু হলো।"

পাশে চক্ররেলের লাইন দিয়ে ট্রেন যাওয়ার আওয়াজের জন্য একটু থামলেন হাবুদা।। ঝালমুড়ি ঠোঙাটা ভালো করে ঝেড়ে, যেটুকু যা ছিল সেটা মুখে পুরে, হাবুদা বলতে শুরু করবেন, এমন সময় অনীশের প্রশ্নবাণ, "আচ্ছা হাবুদা এই যে ওপারে হাওড়া শহর, ওখানেও তো ট্রাম চলতো। সে সম্বন্ধে তো কিছু বলছেন না?"

"ধীরে বৎস" মুচকি হেসে বললেন হাবুদা, "সব কিছুই দুমদাম বলে দিলে কি আর গল্প জমে! আসছি সেকথায়।" বলে একজন চা ওয়ালাকে ডেকে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে তিনি বললেন, "তো নতুন ট্রাম আসার পর নতুন নতুন এলাকায় ট্রামলাইন পাতার কাজও চালু হলো। এবং পরবর্তী কিছু বছরের মধ্যে শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ট্রামের আওতার মধ্যে চলে আসে। যার মধ্যে প্রধান হলো আমাদের হ্যারিসন রোডের লাইন।"

"মানে যেখানে ব্যোমকেশ বক্সী থাকতেন।" কল্যাণের সংযোজন, "এখন যাকে এম জি রোড বলা হয়।"

"ঠিক বলেছো, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যারিসন রোডেরই এক মেসে থাকতেন। বিভিন্ন বাংলা সাহিত্য/উপন্যাসে ট্রাম কিন্তু বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তো সে যাইহোক, শিয়ালদা থেকে সোজা একটা লাইন একেবারে হাওড়া ব্রীজের দোরগোড়ায় পৌছে গেল। তখনকার হাওড়া ব্রীজ কিন্তু এখনকার মতো বিশালাকায় ছিল না। মনে আছে একবার ব্রীজের গল্প বলেছিলাম তোমাদের?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলেন যে হাওড়া ব্রীজ তখন পন্টুন ব্রীজ ছিল। জাহাজ গেলে খুলে যেত।" স্মৃতি হাতড়ে জলদি বললাম।

"ইয়েস কারেক্ট", মুখ দিয়ে চকাস করে একটা শব্দ করে চায়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললেন হাবুদা। "তো এই পন্টুন ব্রীজের সাধ্যি ছিল না যে তাতে ট্রাম চলতে পারে। তাই এপারেই থেমে থাকলো লাইন। কিন্তু তাই বলে হাওড়াতে কিন্তু ট্রামের প্রবর্তন আটকালো না। হাওড়ার তৎকালীন কমিশনারের সাথে সিটিসি চুক্তিবদ্ধ হলো ১৯০৫ সাল নাগাদ। এবং ১৯০৮ সালের মধ্যে হাওড়া স্টেশনের সাথে উত্তরে বাঁধাঘাট এবং দক্ষিণে শিবপুরের ট্রাম যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে বর্তমান হাওড়া ব্রীজ তৈরি হওয়ার আগে অবধি দুই শহরের মধ্যে ট্রাম যোগাযোগ ঘটতে পারে নি।"

"আচ্ছা হাওড়ায় শুনেছি যে নাকি দুমুখো ট্রাম চলতো" নিরীহ মুখে অনীশের আচমকা ব্যাগড়া।

"শুনেছ না কি গুগল করে পেয়েছ" পাল্টা প্রশ্ন হাবুদার।

অনীশটা ইদানিং কল্যাণের নতুন স্মার্টফোনে হাবুদার বলা বেশ কিছু তথ্য যাচাই করতে শুরু করেছে। এখনো অবধি তেমন ভুল কিছু বের করতে পারে নি অবশ্য। আসলে ও পাঁড় ইস্টবেঙ্গল সমর্থক তাই হাবুদার সাথে আড়ালে একটা বিরোধ আছেই।

"ইয়ে মানে ওই আর কি"।

"হুঁ, ঠিকই দেখেছ। আসলে হাওড়া শহরটা খুবই ঘিঞ্জি আর শিবপুরের ওই অঞ্চলের তো প্রায় দমবন্ধ অবস্থা তখনই। তাই ওখানে ট্রাম ঘোরানোর মত জায়গা কল্পনা করাও বিলাসিতা। ব্রিটিশরা তাই সে ধার দিয়েও গেলো না। ওরা দুমুখো ট্রাম নিয়ে এলো হাওড়ায় চালানোর জন্য, যাতে ঘোরানোর দরকারই না পড়ে।" এ পর্যন্ত বলে হাবুদা উঠে পড়লেন। "চলো হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে। রাত হয়ে আসছে। তোমরা শ্যামবাজার ডিপো থেকে ট্রামে উঠে যেও।"

অতঃপর হাঁটতে লাগলাম সবাই।

ট্রাম রাস্তা ধরে বি কে পালের দিকে কিছুটা এগিয়ে, তারপর একটা বাঁদিক ঘুরে আবার শুরু করলেন হাবুদা। "কলকাতায় সেযুগে ট্রামের রমরমা। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রুট খুলে গেলো। যেমন ধরো, প্রথমেই এই একটু এগোলে যে গ্রে স্ট্রিট পড়তো, সেখানে ট্রাম চললো ১৯০২ সালে। আমাদের শ্যামবাজার ডিপো চালু হলো তার পরের বছর এবং একই সাথে বেলগাছিয়াও খুলে যায়। তার সাথে ওদিকে দক্ষিণে কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জ লাইনও চালু হয় একই বছরে। ইতিমধ্যে ট্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একটা কারখানা দরকার হয়ে পড়লো। এবং ১৯০২ সালে তার জন্য খোলা হলো আমাদের নোনাপুকুর ওয়ার্কশপ।

"আচ্ছা এই যে বাগবাজারের ট্রামলাইন এটা তো বললেন না। এটা কি আরো পরে হয়েছিল?" অনীশ আবার।

"কেন তোমার গুগল বাবা বলেনি সেকথা?" খেঁকিয়ে উঠলেন হাবুদা। বড় রাস্তা পার করে শ্যামপুকুরের তস্য গলির ভেতরে সেঁধিয়ে প্রথমেই একটা ছোট্ট দোকান। ঝট করে কয়েকটা বাদাম পাটালি কিনে হাবুদাকে একটা দিলাম। নিমেষে দিল খুস।

"এই জন্য পটলা আমার ফেবারিট", বলে এক টুকরো মুখে দিয়ে আবার শুরু করলেন। "তাহলে শুনুন দিগ্গজ মশাই, ওই বাগবাজারের ট্রাম চালু হয় ১৯০৪ সালে, যখন কুমোরটুলি থেকে লাইন এসে পৌঁছল বাগবাজার ডিপোতে। এবং ওখানেই থেমে গেল। গালিফ স্ট্রিট অবধি কিন্তু যায়নি। এরপর হাওড়া ব্রিজ অবধি যেটা বললাম সেই লাইন চালু হলো ১৯০৫এ। তারপরের কিছু বছরে, পর্যায়ক্রমে মৌলালী থেকে নোনাপুকুর, ওদিকে খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ থেকে মোমিনপুর, এদিকে শ্যামবাজারের সাথে গালিফ স্ট্রিট - ট্রামের পরিসর ক্রমশ বাড়তেই থাকলো। ১৯০৮ সালে হাজরা থেকে মোমিনপুরের লাইনের কাজ শেষ হলো। এবং একইসাথে মোমিনপুর থেকে বেহালার কাজও শেষ হয়ে গেল। ১৯১০ নাগাদ খোলে শিয়ালদা থেকে রাজাবাজার। এর সাথে

সমান তালে কিন্তু নতুন নতুন ট্রাম গাড়িও কেনা হচ্ছিল। ১৯১৪র মধ্যে ট্রাম কোম্পানির কাছে ২৪৫টা মোটর কোচ ও সমপরিমাণ সেকেন্ড ক্লাস বা ট্রেলার কোচ হয়ে গেছিলো। কিন্তু এরপর লাগলো গন্ডগোল। "

"কেনো কেনো???" সমস্বরে ব্যাকুল প্রশ্ন আমাদের।

"কলকাতায় ১৯২০ সালের কিছু আগেপরে মোটর চালিত বাস পরিষেবা চালু হয়। যদিও তা এখনকার মতো ট্রামকে গিলে ফেলতে পারেনি কিন্তু টক্কর দিতে আরম্ভ করলো। তখনই হঠাৎ করে সিটিসির গবেটদের মাথায় ঢুকলো যে বাস চালু করলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। পার্ক সার্কাস থেকে হাওড়া ব্রীজ অবধি বাস পরিষেবা চালু করে দিলো। সেটা প্রায় পাঁচ বছর চলার পরে বন্ধ হয়। এদিকে প্রায় একই সময় নোনাপুকুর থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে সোজা একটা লাইন পার্ক সার্কাসে গিয়ে মিশলো ১৯২৫শে। এবার একটা ব্যাপার ঘটলো। দ্বিতীয় বার ট্রাম চালু হবার পর, এই প্রথম একটা লাইন তুলে দেওয়া হলো। বলতে পারবে কোনটা?"

আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি দেখে আবার বললেন, "আরে একটু যুক্তি দিয়ে ভালো করে ভাবো।"

ইতিমধ্যে আবার বড় রাস্তা এসে পড়লো। সেটা ক্রস করে মেট্রো স্টেশনের গা ঘেঁষে একটা রাস্তায় ঢুকে, আমিই আমতা আমতা করে বললাম, "মানে ঠিক মাথায় আসছে না আর কি। আপনিই বলুন না।"

"আরে পার্ক স্ট্রিটের একটা অংশ বন্ধ হলো। এটুকু বুঝলে না।" ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন হাবুদা, "লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়েই তো পার্ক সার্কাস যাচ্ছে তখন শুধু শুধু এদিকে লাইন রেখে কি লাভ। বিশেষ করে পার্কস্ট্রিট অঞ্চল ছিল সাহেবদের খাস এলাকা। তাই ওদিকটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তো যেটা বলছিলাম। এরপর ১৯২৭ সালে বাবুদের রেস খেলার মাঠে একটা টার্মিনাস তৈরি হলো। কেন সে প্রশ্ন কোরো না, উত্তর জানা নেই। এবং নীতিগত ভাবে আমি এর বিরুদ্ধেই বলতে পারো। এখন অবশ্য ওসব নেই। কিন্তু ছিল একসময়। সে যা গেছে তা যাক। বাকিটুকু চট করে বলে নেই। এরপর ১৯২৮ সালে কালীঘাট থেকে বালিগঞ্জ অবধি ট্রামও চালু হলো। অন্যদিকে জোরকদমে নিত্যনতুন ট্রামগাড়ির আমদানিও কিন্তু সমান তালে চলছিল। ১৯৩১ থেকে '৩৯এর মধ্যে তৎকালীন ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে ১৩৪টি দু-কামরার K-class ট্রাম কেনা হয়। আরো পাঁচটা K-class ট্রাম নোনাপুকুরে তৈরি করা হয়। নেট ঘাঁটলে K-class ট্রামের ছবি পেতে পারো। তখনকার দিনে সারা বিশ্বে এইধরনের ট্রাম সব থেকে বেশি যাদের কাছে ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল আমাদের সিটিসি! বাকিটা পরে বলবো। ওই দেখো তোমাদের দিকে যাবার ট্রাম আসছে।" কখন যে টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়েছি খেয়াল ছিলনা। হাবুদার কথায় সম্বিত ফিরতে দেখলাম একটা এক নম্বর ট্রাম আসছে। আর এই ফাঁকে দেখি হাবুদা হাওয়া।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় *ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং মৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত*

হাওড়া ব্রিজে ট্রাম *ছবিটি CTUA সংস্থা দ্বারা প্রেরিত এবং মৃত্তাবিকার দ্বারা সংরক্ষিত*

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর সময়কালটা মনে আছে কারো" চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্নটা করলেন হাবুদা। বসে আছি কফি হাউসের ওপরতলায়। নিচে জায়গার অমিল। তাই অপছন্দ সত্বেও ওপরেই বসতে হলো।

কল্যাণ বললো, "বোধহয় ১৯৩৯ থেকে শুরু হয়েছিল।"

"কারেক্ট, আর শেষ হয়েছিল '৪৫ সালে। চারিদিকে অস্থিরতা, কালোবাজারি, দৈন্যতা ইত্যাদি। কিন্তু ট্রামের পরিচালনায় কিন্তু কোনরকম হেরফের ঘটেনি। উল্টে এই সময় যাত্রীসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছিল। বাদুরঝোলা কথাটা কিন্তু এসেছিল এই ট্রামের ভীড়ের কারণেই।" একটু থেমে ইনফিউশন কফিতে একটা চুমুক দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, "ভাবতে পারো, ওই যুদ্ধের বাজারেও কিন্তু ট্রামের সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল। যেমন ধরো ১৯৪১এ রাজাবাজার থেকে একটা লাইন সোজা আপার সার্কুলার রোড ধরে এসে পৌঁছলো শ্যামবাজার মোড়ে এবং আরেকটু এগিয়ে গালিফ স্ট্রীটে গিয়ে শেষ হলো। কিন্তু বাগবাজার থেকে গালিফ স্ট্রিট কিন্তু এবারো জোড়া হলো না। তারপর সেদিন যেটা বলছিলাম ১৯৪২ সালে নতুন হাওড়া ব্রীজ যাকে রবীন্দ্র সেতুও বলা হয় সেটা তৈরীর কাজ শেষ হলো। তার পরের বছর এটাকে সর্বসাধারণের ব্যবহারে খুলে দেওয়া হলো। বলতে পারবে, যে প্রথম কোন গাড়ি এই নতুন হাওড়া ব্রীজ দিয়ে ওপারে গেছিলো?"

এটা জানা ছিলোনা কারো। আমাদের মাথা চুলকাতে দেখে নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিলেন হাবুদা, "জেনে রাখো ১৯৪৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রথম যে যাত্রীবাহী যানটি কলকাতা থেকে ব্রীজ পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিল সেটি ছিল একটি ট্রাম।"

আমরা হাঁ। ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী, বাস ছেড়ে শেষে ট্রাম!!! এটা ভাবতেই পারি নি। আমাদের মুখের বোকাটে অবাক ভাবটা উপভোগ করে, ফের একটা ইনফিউশন অর্ডার দিয়ে হাবুদা বললেন, "বলেছিলাম না যে কলকাতার ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এরকম চমকপ্রদ কাহিনী আছে। তো যেটা বলছিলাম। ওই একই বছর, অর্থাৎ '৪৩শের নভম্বরে, পার্ক সার্কাস থেকে লাইনটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মেলানো হলো গড়িয়াহাটের মোড়ে কালীঘাট-বালিগঞ্জ লাইনের সাথে। এর সাথে সাথে গড়িয়াহাট ডিপোও খুলে গেলো। এর ফলে মোটামুটি ভাবে শহরের প্রায় প্রতিটি প্রধান এলাকায় ট্রাম পৌছে গেল স্বাধীনতার আগেই।" একটু থামতে হলো কারণ দ্বিতীয় রাউন্ডের কফি এসে পড়েছে। সন্ধ্যার কফিহাউস গম গম করছে।

"আচ্ছা দাদা" গরম কফিতে চুমুক দিয়ে কথাটা বললো কল্যাণ, "কলকাতার কিছু ট্রামকে শুনেছি হাতি বলে ডাকতো। কেনো বলুন তো সেগুলো কি বেশি চওড়া হতো।"

"আরে ধুর হাতি নয়। হাতি-গাড়ী বলে ডাকে। তবে তার সাথে চওড়া হবার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"তাহলে?"

হাতি-গাড়ী ট্রাম ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

"শোনো তবে।" বেশ বড়সড় একটা চুমুক দিয়ে শুরু করলেন হাবুদা। ১৯৪২ থেকে '৪৫ সালের মধ্যে নোনাপুকুর তৈরি করে ১৪টা নতুন L-class ট্রাম। এগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, এগুলোর মুখের দিকে আর পেছনের দিক বাকি ট্রামের থেকে বেশি বাড়ানো ছিল ফলে দুই কামরাতেই জায়গা বেশি পাওয়া গেলো। এছাড়াও মুখের দিকে মাথার কাছটা এবং দ্বিতীয় কামরার শেষদিকটা এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে ঠিক হাতির মাথা আর পেছনের মত দেখতে লাগে। আইডিয়াটা কার মাথায় এসেছিল জানিনা। কিন্তু গাড়িগুলো দেখতে মন্দ লাগতো না। ১৯৫১ সালের মধ্যে আরো ছাপ্পান্ন খানা এই ধরনের L-class ট্রাম তৈরি করা হয়। এছাড়াও Leicester & Leeds থেকে প্রায় গোটা তিরিশেক পুরোনো ট্রামের ট্রাক বা chasis আনানো হলো। তার সাথে ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে ৩০ ট্রামের কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি পার্টস কিনে নোনাপুকুরে জোড়া লাগিয়ে নতুন ট্রাম বানানো হলো। সত্যি কথা বলতে সীমিত ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পার্টসের অমিল সত্বেও নোনাপুকুরে কিছু জিনিয়াস ছিল যারা ট্রামটাকে ভালবেসে অনেক অসাধ্য কাজ করেছিল। এবং সুযোগ পেলে এখনো করতে পারতো। কিন্তু পোড়া দেশ বলে কল্কে পেলনা। সে যাক, এদিকে বিভিন্ন যে লাইনগুলো ধর্মতলায় এসে একত্রিত হতো সেখানে ট্রামজট এড়াতে নতুন করে লাইন আর লুপগুলো realign করার কাজ শুরু হলো একান্ন সালেই। এবং ৫৩ সালে ওই কাজ শেষ হবার পর ধর্মতলা ট্রাম টার্মিনাসে লাইনের নকশা বিশ্বের জটিলতম নকশাগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এরপর থেকে লাগলো গন্ডগোল।"

কফি শেষ। প্রশ্ন করে লাভ নেই জানি নিজের থেকেই যা বলার বলবেন তাই সবাই চুপ থাকলাম। "পেটে খিদে আছে কারো?" হঠাৎ প্রশ্ন হাবুদার।

কল্যাণ সবার হয়ে মাথা নেড়ে বললো, "হ্যাঁ আছে। সেই দুপুরে ক্যান্টিনে খেয়েছি।"

"হু তাহলে চলো তোমাদের আজ একটা দারুন জিনিস খাওয়াব।"

কফিহাউস থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে একটা ২ নম্বর ট্রামে উঠে শ্যামবাজার ডিপোর আগেই নেমে বাগবাজারের দিকে হাঁটতে লাগলাম। গলি, তস্য গলি ও মাঝে দুখানা বড়রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে গলির মধ্যে একটা দোকান তার সামনে উত্তুঙ্গ ভিড়। জানলাম এটা হচ্ছে বাগবাজারের বিখ্যাত মাছের কচুরির দোকান। জিভে জল আনা গরম গরম কচুরি সাথে অদ্ভুত সুন্দর আলুর দম গলাদ্ধকরন করে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করছি এমন সময় হাবুদা আবার শুরু করলেন। "কচুরি খেয়ে যতটা ভাল লাগলো এর পরের ঘটনা শুনলে অত ভাল কিন্তু লাগবে না। কারণ ট্রামের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ কিন্তু এই ৫০এর দশক থেকেই অল্পবিস্তর আরম্ভ হয়েছিল।" কচুরি চিবোতে চিবোতে বললেন হাবুদা। "যারমধ্যে প্রধান কারণ হিসেবে বলতে পারো যে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরবর্তী সময়টা যেটা সমগ্র ভারত তথা আমাদের বাংলার জন্যও একবারেই সুখকর ছিল না। দেশভাগের জন্য অনিয়ন্ত্রিত শরণার্থীদের ভিড় বাংলাকে এক অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক আকাশেও তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। এবং তাতে ট্রাম কোম্পানি পড়লো বেজায় ফাঁপরে। মূলধনে টান পড়ার কারণে তারা রাজ্য সরকারের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হলো এবং কলকাতা ট্রামওয়ে আইন ১৯৫১ পাশ হলো। এই চুক্তি অনুসারে এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে ১৯৭২ সালের পয়লা জানুয়ারি বা তারপরে যেকোনো সময় রাজ্য সরকার ট্রাম অধিগ্রহণ করতে পারবে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে অর্থাৎ সাড়ে তিন মিলিয়ন পাউন্ড দরে। আবার এতসবের মধ্যেও কিন্তু ৫০এর দশকের শেষে ট্রাম কোম্পানির হাতে রেকর্ড সংখ্যক ট্রাম ছিল। জানা যায় যে ১৯৫৯ সালে কোম্পানির হাতে ৪৭০টি ট্রাম ছিল এবং বাৎসরিক যাত্রীসংখ্যা ছিল ৪০ কোটির ওপর যা সর্বকালীন রেকর্ড।"

এই অবধি বলে মুখ ধুতে গেলেন হাবুদা। যা খেলাম তাতে রাত্রিবেলা আর খেতে হবে না বলেই মনে হয়। ফিরে এসে নিজেই সবার বিল মিটিয়ে ফেরার পথে আবার মুখ খুললেন হাবুদা। "এই যে এখন দেখো ট্রামের বিভিন্ন নম্বর এটা কিন্তু আগে ছিলো না। তার বদলে কি ভাবে কাজ চলতো বলতে পারবে?"

"বোর্ডে জায়গার নাম লেখা থাকতো।" অনীশের চটপট জবাব।

"খুব ভুল বলনি, আন্দাজটা ভালই করেছো। তবে একটা 'কিন্তু' আছে যে।"

"কিন্তু?"

"হ্যাঁ এই 'কিন্তুটা' হল যে, তখনকার যুগে কলকাতায়ে পড়াশোনা জানা মানুষের সাথে প্রচুর নিরক্ষর মানুষেরও আনাগোনা ছিল। তাদের পক্ষে ইংরেজিতে রুটবোর্ড পড়াটা বেশ অসুবিধেজনক ছিল। তাই সাহেবরা মাথা থেকে একটা দারুণ বুদ্ধি বার করেছিল তা হল বিভিন্ন রুটের বিভিন্ন রঙ লাগানো বোর্ড এবং বাতি যা থেকে খুব সহজে বোঝা যেত যে ট্রামটা কোন জায়গায় যাবে। মানে ধরো লাল রঙ দেওয়া মানে কালীঘাট যাবে ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় পঞ্চাশের দশকের শেষে। কলকাতার ট্রামে রুটনম্বর ব্যবস্থা চালু হয়। ১ থেকে ৫০ অবধি নম্বর ধার্য করা হয় তারমধ্যে ২৬টি ব্যবহৃত হয় বাকিগুলো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে বিভিন্ন রুটের নম্বর চালু হতে থাকে। হাওড়াতেও একই ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। এরপর আসে ষাটের দশক যখন ট্রাম কোম্পানির আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো তাতেও নতুন ট্রাম তৈরি করা থামলো না বরং আরো ২০টা ট্রাম তৈরি হয়। ওদিকে বোম্বাইয়ের ট্রাম লাটে উঠলো এবং সেখান থেকে কলকাতা পেয়ে গেল ৪৫ জোড়া চাসিস বা ট্রাক যাই বলবে। এগুলির কিছু দিয়ে নোনাপুকুর বানালো একটা নতুন শ্রেণীর ট্রাম – PAYE Class (Pay As You Enter) অর্থাৎ ওঠামাত্র ভাড়া কাটতে হবে। এই ট্রামগুলো দেখতে অদ্ভুত সুন্দর করেছিলো। ড্রাইভার কেবিনের পাশ দিয়ে ওঠার দরজা এবং অন্যদিকে নামার দরজা পৃথক। এই ব্যবস্থা কিন্তু জনপ্রিয় হলো না, কারণ তা ছিল কলকাতার যাত্রীদের

PAYE-শ্রেণীর দু-কামরার ট্রাম ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ধ্যানধারণার পরিপন্থী। আরে বাপু আমরা রসে-বশে বাঙালি। রয়ে-সয়ে উঠে জাঁকিয়ে জানলার ধারটি বেছে বসবো, খেলা-রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে পাশের যাত্রীর সাথে তর্ক জুড়বো, কন্ডাক্টর ভাড়া চেয়ে চেয়ে হাঁফিয়ে যাবে তাও ঠিক নামবার আগে টিকিট কাটবো, তবে না। তাড়াহুড়ো করার বদ অভ্যাসটা আমাদের একেবারেই নেই কি বলো অ্যাঁ, হে হে। যাও এবার কেটে পড়ো, পরে কথা হবে। ওই দেখা যায় তোমাদের বাহন।" বলে একটা এক নম্বর ট্রাম দেখিয়ে দিয়ে সুট করে পাশের একটা গলিতে ঢুকে গেলেন হাবুদা।

ফিশ কবিরাজিতে একটা কামড় বসিয়ে হাবুদা শুধলেন, "ঘুনধরা কাকে বলে জানো?"

"হ্যাঁ জানি। এক ধরনের কাঠের পোকা। একবার ধরলে আর ছাড়ান নেই" বলে অনীশ।

সপ্তাহের মাঝে একদিন ক্লাস শেষের পর এসে দিলখুশায় বসেছি আমরা সবাই। বিল মেটাবে কল্যাণ কারণ ওর বহুদিনের একটা শখ গতকাল পূরণ হয়েছে। ইডেনে প্রথমবার স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছে। সেবারের আইপিএল এর প্রথম ম্যাচই ছিল কলকাতায়। কেকেআর বনাম মুম্বাইয়ের খেলা ছিল। কেকেআর জিতেছে। কল্যাণ পরিতৃপ্ত খেলা দেখে আর আমরা তৃপ্ত দিলখুশাতে ট্রিট পেয়ে।

"ঠিক তাই। ছাড়ান নেই। কলকাতার আদরের ট্রামের সেই ঘুনধরা রোগে পেয়েছে। রোগটা আজকের নয়। গত পাঁচ দশকের।" বললেন হাবুদা। "১৯৬০এর পর থেকেই ট্রামটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রবণতা ক্রমশ বেড়েছে। একদিকে যেমন নিত্য নতুন ট্রাম কেনা বা বানানো চলছিল, তেমনি অন্যদিকে কোম্পানির ভাড়ার ক্রমশ খালি হচ্ছিল। আরেকদিকে পরিকাঠামোর দেখভালের দিকে নজরদারি এবং লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ ধীরে ধীরে কমতে থাকলো। তার সাথে ভয়াবহ লোডশেডিংএর উৎপাত। ফলে কি হলো, গাড়ি ডিপোতে বেশি আর রাস্তায় কম দেখা যেত। '৫৯ সালে যেখানে দিনে ৪১৩টা ট্রাম চলতো সেখানে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সেই সংখ্যাটা নেমে দাঁড়ালো ৩৬১তে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে স্ট্রাইক, বাজারে টাকার দর কমায় বিদেশি যন্ত্রপাতি আনানো প্রায় বন্ধ হলো, মাঝে মাঝেই লাইন ভেঙে ট্রাম বেলাইন হওয়া, লোডশেডিং ইত্যাদি সমস্যা বাড়লো বৈ কমলো না। এবং এতো বছরে প্রথমবার যাত্রীসংখ্যার নিরিখে বাস টেক্কা দিতে লাগলো ট্রামকে। আর বৃত্তটা সম্পূর্ণ করেছিল সরকারি অধিগ্রহণ।"

ফিশফ্রাইটা অসাধারণ কিন্তু ঘটনাগুলো শুনে মনটা কেমন খারাপ করে দিলো। এতো সুন্দর একটা জিনিসকে বিদেশে কতো যত্নআত্তি করা হয় কিন্তু এখানে কিরকম ছ্যাকড়া গাড়ি মার্কা অবস্থা করে ছেড়েছি আমরা।

"এরপর এলো একাত্তরের অস্থির সময়।" বলে চললেন হাবুদা। "একদিকে নকশাল আন্দোলন, অন্যদিকে ভারত-পাক যুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, এপার বাংলায় শরণার্থীদের ভীড়, তার সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যাপকহারে দুর্নীতি রাজ্যবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ট্রামও ছাড় পায় নি। ভাঙচুর থেকে শুরু করে জ্বালানো পর্যন্ত হয়েছিল। এবং এই সময় থেকেই নানান ছুতোয় কিছু কিছু ট্রাম রুট পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও সরকারের যৌথ ছ্যাঁচড়ামিটাও শুরু হলো। সবার প্রথম গেলো হাওড়ার ট্রাম। বাহাত্তরের মধ্যে যার গোটাটাই উঠিয়ে দেওয়া হলো। শুধু কলকাতার দিক থেকে হাওড়া স্টেশন অবধি লাইনটা থাকলো। তারপর ১৯৭৩এ হাত পড়লো কলকাতার দিকে। প্রথম বন্ধ করলো হাওড়া ব্রীজ-স্ট্র্যান্ড ব্যাংক রোড-নিমতলা রুট। বলা বাহুল্য যে এর পেছনে পুরোপুরি রাজনৈতিক মদত ছিল। কারণ ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের আবদার ছিল যে ট্রাম আসা যাওয়ার কারণে বেআইনি ভাবে তাদের ট্রাক দাঁড়াতে পারছে না। এরপরের ঘটনা ১৯৭৪ সালে, রাজাবাজারের ভেতরে, হঠাৎ এক রাতে আগুন লেগে ৪৪টা ট্রাম পুড়ে শেষ হয়ে গেছিলো। কিভাবে লেগেছিলো, নাকি ইচ্ছাকৃত নাশকতা সেটা জানা যায় নি বা জানতে দেওয়া হয়নি। এদিকে রাস্তায় তখন ট্রামের সংখ্যা আরো হ্রাস পাচ্ছে, যা চুয়াত্তর সালে নেমে এলো দিনে ২৮৩টি ট্রামে আর ১৯৭৬ এর জুলাই মাসে মাত্র ২২৫ টি ট্রাম রাস্তায় নামত। কিন্তু কোম্পানির হতে ট্রাম তখনো চারশোর ওপর। এমনকি হাওড়ার থেকে কিছু ট্রাম এনে সেগুলোকেও কাজে লাগানো হলো। এদিকে রেস কোর্স টার্মিনাসটাও বন্ধ হলো ১৯৭৬ সালে। এরপর শুরু

সুন্দরী ট্রাম
ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

হলো কলকাতার ট্রামের ইতিহাসের সব থেকে নোংরা ও অন্ধকারময় সময়।" এই অবধি বলে থামলেন হাবুদা।

ফিশফ্রাই শেষ। সবার একটা করে কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার করা হলো।

নিজের ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক-এ একটা চুমুক মেরে ফের বলতে শুরু করলেন। "১৯৭৮ সালে ট্রাম পরিচালনার ভার পুরোপুরি ভাবে রাজ্য সরকারের অধীনে চলে এলো। এরপর ট্রাম ধ্বংসের এক ভয়ঙ্কর খেলা শুরু হলো। প্রথম কোপটা মারা হলো দমদম-টালিগঞ্জ মেট্রোর ধুয়ো তুলে। ১৯৭৮ এ ধর্মতলা থেকে প্ল্যানেটেরিয়াম হয়ে হাজরা অবধি ট্রাম তুলে দেওয়া হলো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কাজ শেষ হলেই 'ফিরিয়া আসিবে সে'। কিন্তু বাস্তবে 'আর আসিল না, সূর্য গেলো অস্তাচলে। কিছুদিন পর অবশ্য ধর্মতলা থেকে প্ল্যানেটেরিয়াম অবধি একটা রুট আবার চালু হয়েছিল। কিন্তু বাকিটা হয়নি। তার বদলে গাদা গাদা বাস রুটের পারমিট দেওয়া হলো। এরপর আরও একটা অবাক কান্ড!! ১৯৮১ সালে শিয়ালদা উড়ালপুল থুড়ি- 'হকারপুল' বানানোর জন্য ট্রামের অন্যতম ঘাঁটি শিয়ালদা টার্মিনাস চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এতে আরেকটা বিরাট ধাক্কা খেল সিটিসি। ট্রামের আয়ে এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গেল। ওই বছরেই অর্থাৎ একাশিতেই বেন্টিংক স্ট্রিট দিয়েও ট্রাম বন্ধ করা হলো মেট্রোর কাজের জন্য। সেটাও আর খোলেনি।

"হকারপুল না কি একটা যেন বললেন, তার মানে?" অনীশের প্রশ্নবাণ।

"আগে বলো উড়ালপুলের কাজ কি?

"কোনো রাস্তার মোড়ে যানজট বেশি হলে ওপর দিয়ে সহজে গাড়ি পাস করানোর রাস্তা।" অনীশের চট জলদি জবাব।

"তাহলে এবার বলো শিয়ালদা পুলের নিচে কোন রাস্তা আছে যেটাতে যানবাহন চলছে এখন? এবং যদি গাড়ি যাওয়া আসার জায়গা না থাকে তাহলে উড়ালপুলের সার্থকতা কোথায়? শুধু মানুষ পারাপার করার জন্য নিশ্চয়ই কেউ কোটি কোটি টাকা খরচ করে পুল বানায় না। উত্তরটা সোজা। তৎকালীন 'জনদরদী' সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং বেআইনি হকারদের দোকান করার জন্যই একমাত্র ওই শিয়ালদা উড়ালপুল বানিয়েছিল। যুক্তি দিয়ে ভাবলে এছাড়া কোনো সদুত্তর পাবে না। তো যাইহোক, শিয়ালদা হকারপুল তৈরি শেষ হলো বিরাশিতে। দেখা গেলো তাতে ট্রামলাইন আছে। কিন্তু যেখানে আগে ট্রেন থেকে নেমেই সোজা ট্রামে চেপে অফিস পাড়ায় বা হাওড়ায় বা আর জি কর হাসপাতালে যাওয়া যেত সেই ট্রাম এখন পেতে হলে অনেকটা হাঁটা পড়তে লাগলো। ব্যাস এই সুযোগটাই কাজে লাগলো তৎকালীন সরকারপোষিত বাস আর ছারপোকারা।"

"ছারপোকা???!!!"

বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের তৈরি ১৯৮২র মডেলের ট্রাম ছবি: রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

মিটিমিটি হেসে হাবুদা বললেন, "আরে অটো অটো। খাটে ছারপোকা থাকলে যেমন ঘুমের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে তেমনি কলকাতার সাড়ে বারোটা বাজাতে মহা ধুমধামে এসে পড়লো অটো। এবং পুরোপুরি ভাবে রাজনৈতিক মদতপ্রাপ্ত হয়ে। এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রথমে সেগুলো চালু হলো টাক্সির মত মিটারওয়ালা। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের পরেই সেগুলো রুট অনুযায়ী চলতে আরম্ভ করলো প্রধানত ট্রামরুট গুলোতে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আশাকরি। একটি দূষণমুক্ত যানের বদলে শয়ে শয়ে দূষণকারী ছারপোকা। সে যাক, ফিরে আসি ট্রামে। হ্যাঁ তো এরপর হঠাৎ ঘটলো ম্যাজিক।"

"ম্যাজিক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্যাজিকই বলা চলে। ১৯৮২ সালে ট্রামের শততম বছর উপলক্ষে বিশ্বব্যাংক একটা বড়সড় অনুদান পাঠালো সিটিসিকে। রাজ্য সরকারের অবশ্য তার আগে অবধি শতবর্ষ উদযাপন নিয়ে কোনো হেলদোল ছিল না। বরং তৎকালীন সরকারের একজন মূর্খ মাতব্বর এও বলেছিলেন যে ট্রামের নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু টাকার লোভ বড় বিষম ভায়া। মহা আরম্ভরে তাই ট্রামের খোলনলচে বদলানোর কাজ আরম্ভ হলো। বিরাশি থেকে উনোনব্বইয়ের মধ্যে প্রায় ৭৫টা নতুন ট্রাম কেনা হলো। আরো শদেড়েক মত ট্রাম ভেঙে নতুন করা হলো। কিছু ভাঙা লাইন সারানো হতে লাগলো। সব থেকে দারুণ ব্যাপার ঘটলো যে প্রায় চার দশক পরে ট্রামের নতুন রুট খোলা হলো - মানিকতলা-বিধান নগর আর ওদিকে বেহালা থেকে জোকা। সমস্যাটা বাধল অন্য জায়গায়। কিছু টাকা সরিয়ে রাখার দরকার ছিল ভবিষ্যতে লাইন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। কিন্তু নেতাদের নিজের পকেট ভরার সময় দূরদৃষ্টির অভাব হয়ে না কিন্তু কোন

বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের তৈরি ১৯৮৭র মডেলের ট্রাম ছবি: রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

জেসপ কোম্পানির তৈরি ট্রাম ছবি: রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

গঠনমূলক কাজে সেই দূরদর্শিতা আর চোখে পড়ে না। ফলে বেলাইন হবার ঘটনা নিয়মিত হারে বাড়তে লাগলো। যাত্রীরা বিরক্ত হতে লাগলো। এর মধ্যে ছিয়াশি সালে টালিগঞ্জ থেকে ধর্মতলা অবধি মেট্রো চালু হয়ে গেল। ফলে আরো কমে গেল ট্রামের যাত্রী। এইসব নিয়েই শহরের ট্রাম অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছিল। এরপর বিরানব্বইতে ধর্মতলা-প্ল্যানেটেরিয়াম রুট বন্ধ করে দিল। কারণ চৌরঙ্গী রোডে গাড়ি রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না বাবুরা। অতএব ট্রামকে সেই জায়গা ছাড়তে হলো। এরপর এলো যাকে ইংরেজিতে তোমরা বলো 'দা ফাইনাল ব্লো'। ১৯৯৪ সালে হাওড়া স্টেশন টার্মিনাস বন্ধ করে সেটাকে বাস গুমটি করে দিলো। সিটিসির আয় রাতারাতি গিয়ে ঠেকল তলানিতে। কারণ দেখানো হলো যে মাত্র ৫০ বছর আগে বানানো হাওড়া ব্রিজের নাকি ক্ষতি হচ্ছে ট্রামের জন্য। আর এদিকে অসংখ্য ভারী ট্রাক, বাস, মিনিবাস গেলে অবশ্য ক্ষতি হয়না শুধু ট্রাম গেলেই হয় এরকম একটা ভাব আরকি। আসলে দুকান কাটাদের লাজ-লজ্জা বলে কিছু তো থাকে না তাই ওসব বলেছিল। এরপর পঁচানব্বই সালে স্ট্র্যান্ড রোডের ওপর মানে হাইকোর্ট-ডালহৌসি রুটেও ট্রাম বন্ধ করা হল। আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা এলো ওই বছরেই যখন দমদম থেকে টালিগঞ্জ অবধি মেট্রো পুরোদমে চালু হয়ে গেলো। ট্রাম আরো গেলো লাটে উঠে। এমন যখন অবস্থা হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।" এই অবধি বলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন হাবুদা।

"কি হলো? কি ঘটনা সেটা না বলে চলে যাচ্ছেন যে!!" কল্যাণ বললো।

"আরে রাতের বাজার করতে হবে ভুলেই গেছি। আবার পরে কথা হবে। কল্যান ভাই ফিশ কবিরিজিটা বেঁড়ে খাওয়ালে কিন্তু।" এই বলে রাস্তায় নেমে ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন।

"হাবুদার এই এক বিচ্ছিরি স্বভাব। এমন সব জায়গায় গল্প থামান যে রাগ ধরে যায়।" রেগেমেগে বলে অনীশ। আমরাও আর বসে না থেকে হাঁটা লাগালাম নিজেদের আস্তানার দিকে।

আধুনিক ফাইবার বডি ট্রাম ছবি: রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

মনে একটা উত্তেজনা ছিলই তাই পরের রবিবারেই ফের পাকড়াও করলাম হাবুদাকে। সেদিন আমরা সবাই মিলে গেলাম ধর্মতলায় স্মরণিকা ট্রাম মিউজিয়াম দেখতে। ভেতরের ছিমছাম ভাবে সাজানো জিনিষগুলো দেখতে খারাপ লাগেনি। দেখার পর ক্যাফেটেরিয়াতে বসে কোল্ড কফি খেতে খেতে ফের গল্প শুরু হলো।

"অদ্ভুত ঘটনা হলো অপ্রত্যাশিত বিদেশী সহযোগিতার হাত। ১৯৯৪ সালে রবার্তো ডি আন্দ্রেয়া বলে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের একজন ট্রাম কন্ডাক্টর আসেন ভারত ভ্রমণে। কলকাতার ট্রাম এবং তার দুরবস্থা দেখে তার মনে হয় যে কিছু একটা করা উচিৎ এই ঐতিহ্যকে বাঁচানোর জন্য। তিনি বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোতে গিয়ে নিজের পেশাগত পরিচয় দিয়ে ওখানকার ট্রাম কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব করলেন। এবং ফিরে গিয়ে একটা অভূতপূর্ব আইডিয়া বের করেন। কলকাতা-মেলবোর্ন ট্রামমৈত্রী। এর সুত্র ধরে আবার ট্রামের প্রতি হঠাৎ নজর পড়লো সরকারের। ধুমধাম করে ১৯৯৬ সালে কলকাতা-মেলবোর্ন ট্রামযাত্রা শুরু হলো। এবং ট্রামের পরিকাঠামোর ওপর আবার অল্পবিস্তর কাজ শুরু হলো। নেপথ্যে বিদেশী চাপ একটা ছিল যেটা রবার্তো সাহেবের দৌলতেই হয়েছিল। তাছাড়া কলকাতার কিছু ট্রামপ্রেমী যেমন দেবাশিস ভট্টাচার্য, মহাদেব শি এঁরাও রবার্তো সাহেবের সাথে মিলে একটা চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কিছু বছর অন্তর অন্তর যখন এই ট্রামযাত্রা হতো তখনই শুধু ট্রাম নিয়ে কিছু নাড়াঘাটা হতো বাকি সময় সব ভাঁড়ে মা ভবানী। রবার্তো সাহেব তাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইসবের মধ্যেই ট্রামের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার কাজ শুরু হলো ২০০০ সালে। ট্রামের বুলেভার্ড গুলো তুলে দিয়ে কনক্রিটের রাস্তা করা হলো। এবং মেন রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো। ফলে ট্রাম থেকে ওঠানামা করা এক ভীষম সমস্যা ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। উন্মতের মত স্পীডে ছোটা গাড়ি-বাস ঠেলে টপকে কে যাবে বলোতো ট্রাম ধরতে? ফলে যাত্রী সংখ্যা গেলো আরো কমে। এরপর ২০০২ সালে বেহালা থেকেও ট্রাম উঠিয়ে দিলো তারাতলা উড়ালপুল বানানোর দোহাই দিয়ে। আর ২০১১ থেকে বেহালা-জোকা যেটুকু ট্রাম চলতো তাও বন্ধ হয়ে গেলো মেট্রোর কাজের জন্য। এরপরে তো শুনছি নাকি আগামী বছর থেকে নাকি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের জন্য নাকি ডালহৌসি, ধর্মতলাতেও নাকি ট্রাম বন্ধ হবে। সেটা যদি হয়, তাহলে ডালহৌসির সাথে সাথে লালবাজার, বউবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রীট, চিৎপুর রোড, গ্রে স্ট্রীট, বাগবাজার, গালিফ স্ট্রীট ইত্যাদি রুটগুলোও বন্ধ হবে। মানে উত্তর কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা থেকে ট্রাম উঠে যাবে। মোটকথা কলকাতার ট্রামের লাটে ওঠার দিন আগত। কি বুঝলে।" হাবুদার গল্প শেষ। আমাদের কোল্ড কফি শেষ। স্মরণিকার ভেতরে বসার সময়সীমাও শেষ।

পরবর্তী সময় আমরা সবাই দেখেছি যে, ট্রামকে কি করে আরো অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কখনো জ্যামের দোহাই দিয়ে, কখনো দুর্বল ব্রীজের ধুয়ো তুলে বা মেট্রোর কাজের সুত্রে। বাস এবং অটো ইউনিয়ন গুলিকে তুষ্ট রেখে নিজেদের ভোট ব্যাংক অটুট রাখতে রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা যতটা আগ্রহী, তার ১০ শতাংশও যদি ট্রামের প্রতি আগ্রহটা দেখাতেন তাহলে এই অবস্থা হতনা। এবং কলকাতার অপদার্থ মানুষজনও সমান ভাবে দায়ি কারণ তাঁরা প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন শুধু নিজেদেরটুকু ভেবে ভেবে। সারা বিশ্ব যখন ভয়াবহ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে নানান সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা ঠিক তার উল্টো পথে হাঁটছে। হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতার গর্বের ট্রাম !!!

কলকাতার ট্রামের ইতিহাসের সম্পর্কিত কোনরূপ সহজলভ্য তথ্য বা লেখনী পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তাই আমাদেরকে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ অবধি মডার্ন ট্রামওয়ে ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ওপরেই মূলত ভরসা করতে হয়েছে। এইক্ষেত্রে তাই আমরা ওই অনুচ্ছেদগুলির রচয়িতা, Mr. T. V. Runnacles এবং Mr. G. B. Claydon এর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সৌরশুভ্র মাজি (তথ্য সহায়তা)
সাহিক গুপ্ত (ছবি এবং তথ্য সহায়তা)
ক্যালকাটা ট্রাম ইউসার্স এসোসিয়েশন (CTUA)

প্রচ্ছদ চিত্র: রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।

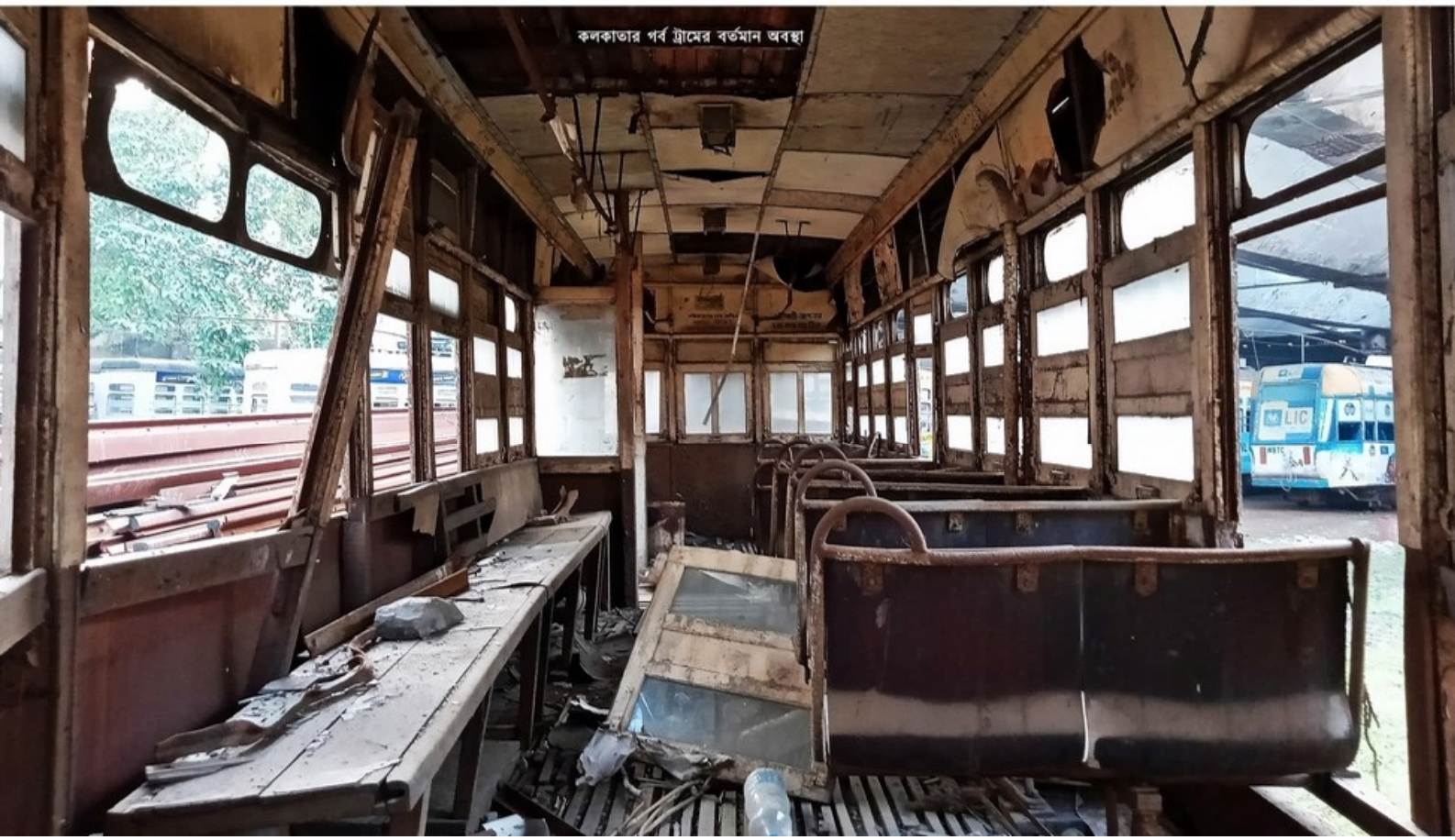

কলকাতার গর্ব ট্রামের বর্তমান অবস্থা

কু ঝিক্ ঝিক্

- শ্রেয়া চক্রবর্তী

পৃথিবীর অন্যতম **শ্রেষ্ঠ** শৈলশহর **দার্জিলিঙের** সৌন্দর্য নিয়ে কোনও কথাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। **তুষারময় শৃঙ্গ** থেকে সবুজ **পাহাড়ের প্রশান্তি**, এ এক **সুন্দরের সাম্রাজ্য**। এর সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য অঢেল। **লাল রডোডেনড্রন**, সাদা **ম্যাগনোলিয়া**, পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে **সবুজ চা গাছে**র বাহার, বনাঞ্চল, ঘরের মধ্যে হানা দেয় **মেঘের দল** -- সব মিলিয়ে দার্জিলিং-কে **পাহাড়ের রানী** করে তুলেছে। ভোরের **কাঞ্চনজঙ্ঘা** এই রানির মাথার **মুকুট**। দার্জিলিং যত বারই বেড়ানো যায়, নতুন করে ধরা দেয় প্রত্যেক বারই **হিমালয়ের কোলে** অবস্থিত এই ছোট্ট শহর। 'দার্জিলিং' নামটির উৎপত্তি **তিব্বতি** শব্দ **'দোরজে'** থেকে, যার অর্থ ইন্দ্রের রাজদন্ড। আজও এই শৈলশহর তার **রাজকীয়তা** নিয়ে স্বমহিমায়। দার্জিলিং'এর আরেক দুনিবার আকর্ষণ হলো তার **শতাব্দি প্রাচীন টয় ট্রেন**। বাচ্চা থেকে বুড়ো বার বার ছুটে এসেছে এর প্রলোভনে। **লেখিকাও** একই আকর্ষণে, রেলপ্রেমী না হয়েও কলম ধরেছেন তাঁর **প্রথম টয় ট্রেনের অভিজ্ঞতা** ব্যক্ত করতে।

বাঙালি মানেই পায়ের তলায় সর্ষে। বেড়াতে যাওয়া ও তার অনুষঙ্গিকে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। আর এই ভ্রমণের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ট্রেনযাত্রা। বেড়ানোর এই নেশা ও অজানাকে জানার টান বাঙালির মজ্জাগত। কেউ বা এই নেশাকে প্রশ্রয় দেন বা কেউ সেটিকে চেপে রেখে সারাজীবন কাটিয়ে দেন।

২০২০ একটি অভিশপ্ত বছর, কেড়ে নিয়েছে কত নিরীহ মানুষের প্রাণ, মানুষের রুটি রুজি আর মুখের হাসিটুকু। বাঙালির কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে বেড়ানোর সুযোগ ও স্বাধীনতা। পাঁচমাসের ঘরবন্দি জীবনে মানুষের মানসিক স্থিতি স্বাভাবিক নেই। ভ্রমণের স্থানগুলি শুনশান জনমানবহীন। স্টেশন নেই কুলিদের হাকাহাকি, জনগনের কোলাহল ও রংবেরঙের ট্রলি ও মানুষের কলকাকলি।

আস্তে আস্তে আনলক হওয়ার পরিস্থিতি হওয়ায় ও সংক্রমণের প্রকোপ কিছুটা নিয়ন্ত্রনে আশায় বাঙালি আবার বেরিয়ে পড়েছিল নানা দিকের হাতছানিতে সাড়া দিতে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। বছরের শেষে তাই সপরিবার বেরিয়ে পড়লাম পশ্চিমবঙ্গের মুকুট, পাহাড়ের রানী 'Queen of The Hills' দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে। ডিসেম্বরের এক নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া থেকে উঠে পড়লাম 02345 সরাইঘাট স্পেশাল ট্রেনে। সামনে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত আমাদের সারথি ছিল হাওড়া শেডের সাদা WAP7। যথাসময়ে ৩টে বেজে ৫০ মিনিটে সুমিষ্ট হর্ন দিয়ে আমাদের ট্রেন যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটলো। ধীরে ধীরে লিলুয়া, বালি ছাড়িয়ে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ধরে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললো আমাদের ট্রেন। শীতের বিকেল ধীরে ধীরে কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিচ্ছিল হুগলি ও বর্ধমানের গ্রামগুলির ওপর। বর্ধমান ছেড়ে খানার পরেই লাল মাটির দেশ বীরভূম আমাদের স্বাগত জানায়। কিন্তু ততক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তাচলে। তাই অগত্যা জানলার শাটার নামিয়ে মন দিলাম বইয়ের পাতায়। ইতি মধ্যেই ট্রেন ছুটে চলেছে স্বভাবসিদ্ধ গতিতে। এরপর গঙ্গা পেরিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করলাম। মালদা টাউন স্টেশনে রাতের খাবার সেরে নিলাম। তারপর আরো বেশ কিছু স্টেশন পেরিয়ে মধ্যরাতে পরে সরাইঘাট এক্সপ্রেস আমাদের নিয়ে পৌঁছে গেল নিউ জলপাইগুড়িতে - দার্জিলিং এর প্রবেশ দ্বারে।

ট্রেন থেকে নামতে নামতেই আমার মন পাড়ি দিয়েছে চা বাগান, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর টয়ট্রেনের দেশে। সেই উদ্দীপনা ও উৎসাহ আপাতত দমিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আলো ফোটার জন্য।

সকালে হতেই যাত্রা শুরু করলাম দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে। পথে নানাসময় নানা জায়গায় ছোট্ট রেলপথটি রোহিনী রোডকে বারবার আঁকিবুঁকি কেটেছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং খাড়াই চড়াই কে মসৃণ করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা অসংখ্য লুপ ও জিগজাগ পথ দিয়ে রেলপথ কে সাজিয়েছিলেন। এর মধ্যে অনেক কটাই বারবার ধ্বংস হয়ে গেছে প্রকৃতির রোষে ও নতুন করে বানাতে হয়েছে। এ জন্যই মূল রেলপথ এক

থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় বারবার রেলপথের জায়গা পরিবর্তিত হয়েছে। ডুয়ার্সের মধ্যে ও সামরিক এলাকার সুকনা রেলস্টেশনকে ছেড়ে রাস্তা এবার আলাদা হয়ে গেল। কিছু ঘন্টা পর, আবার আমাদের সঙ্গে রেললাইনের দেখা হলো কার্শিয়াং নামক এক বিখ্যাত জনপদে।

এখানকার রেলস্টেশনটি বেশ বড়। পাশেই দেখা পেলাম সেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, অর্থাৎ স্টিম ইঞ্জিন। কার্শিয়াংএর লোকো শেডে একটি ইঞ্জিন সাদা ধোঁয়া নির্গত করে জানান দিচ্ছিল - সে তৈরি। তৈরি পর্যটকদের এক নতুন ও অনন্য অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য। সে তৈরি বহু যুগের কত গল্প বলার জন্য।

যাইহোক এই স্বপ্নের মোহ কাটিয়ে আবার আমরা চললাম স্বপ্নের দেশের উদ্দেশ্যে।

হিমালয়ের পাকদণ্ডি বেয়ে পাহাড়ের রানীর দিকে যেতে যেতে, মনে পরে গেলো অঞ্জন দত্তের সেই কালজয়ী গান - টুং সোনাদা ঘুম পেড়িয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে, যখন তখন পৌছে যাওয়া যায়।

দার্জিলিং প্রবেশ করার কিছু মুহূর্ত পরেই দেখা পেলাম সেই ঐতিহাসিক স্টেশনের। দার্জিলিং রেল স্টেশন। যা এখন উনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মূল কেন্দ্রবিন্দু। একটি জয়রাইড এর জন্য দাঁড়িয়ে থাকা টয়ট্রেন আমাদের অভিবাদন জানালো।

বেশিক্ষন এই স্বপ্নের দুনিয়ায় থাকতে পারলাম না কারণ এরপর হোটেলে উঠতে হবে। সবাই পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় ,স্টেশনকে আপাতত বিদায় জানিয়ে চলে চললাম হোটেল এর উদ্যেশ্যে। কথা দিলাম আবার আসবো শীঘ্রই।

দুদিন পর, এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শুধু চোখের দেখায় নয়, এবার ইতিহাসের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ এসেছে। আগে আগেই চলে এলাম দার্জিলিং স্টেশন। আমার সফরসঙ্গী আমার মা ও আমার একটি ভাই, যার সঙ্গে আলাপ আমার অনেকদিনের, এই ভ্রমণের সূত্রেই। স্টিম জয়রাইড এর সুযোগ হারাতে হলো, কারণ সব আসনই আগে থেকে ভর্তি হয়ে গেছে। অগত্যা, ডিজেল জয়রাইডেই টিকিট কেটে নিলাম। এবার হাতে অধেল সময়।

স্টেশন ঘুরে ঘুরে দেখতে ও ছবি তুলতেই সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। তখনই চোখে পড়লো একদম পাশেই, মূল রাস্তার উল্টোদিকেই রয়েছে 'দার্জিলিং স্টিম লোকো শেড'। যেখান থেকে একের পর এক বাষ্প চালিত শকট এই ইতিহাসের কাহিনী শোনাতে বেরিয়ে আসছে। অসীম উৎসাহে সেইদিকে এগিয়ে পরম আগ্রহে দেখতে লাগলাম সেই ঐতিহাসিক লৌহদানব গুলিকে। তারা সবাই যেন ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

দার্জিলিং পাহাড়ের সংগ্রামের কাহিনী, অসংখ্য মানুষের বলিদানের কাহিনী, অবিরাম প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার কাহিনী। এই সব কাহিনীর সাক্ষী দিচ্ছে এইসব ইঞ্জিনগুলির নামকরণ। গায়ে লোহার প্লেটে খোদাই করা, কোনটা 'Queen of the Hills', কোনোটা 'Mountain Sherpa', কোনোটা 'Tusker'। আরো এগিয়ে যেতে দেখলাম কিছু কর্মব্যস্ত মানুষকে।

যাদের মধ্যে কেউ কয়লা ভাঙছেন, কেউ কয়লা বোঝাই করছেন ইঞ্জিনের পিছনে, কেউ অনবরত মেরামত করে চলেছেন, কেউ বা আবার কয়লা ইঞ্জিনগুলির বয়লারে বেলচা দিয়ে প্রবেশ করাচ্ছেন। তাদের অনবরত এই পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফল এই আমরা নিশ্চিন্তে আনন্দ করতে পারছি। সবকিছুকেই লেনসবন্দি করে চোখের লেন্সও ভরে নিলাম এই দারুন অভিজ্ঞতা।

দেখতে দেখতে সময় হয়ে এলো ট্রেনের। ফিরে এলাম স্টেশনে। দেখলাম আমাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ৪ কামরার এই ছোট্ট ট্রেনের। স্বপ্নসত্যি হওয়া বোধহয় একেই বলে। মনে অফুরান আনন্দ ও একরাশ উত্তেজনা নিয়ে নিজের আসনে বসে পরি। ট্রেনে বসে মনে পড়তে লাগলো, দার্জিলিং হিমালায়ন রেলওয়ে এর ব্যাপারে পড়ে আসা নানা তথ্য, ঐতিহাসিক কিছু লেখা এবং নানান কাহিনী। এই রেলপথের সূচনা ব্রিটিশরা করেছিল দার্জিলিংকে মূল ভূখণ্ডের সাথে আরো ভালোভাবে যুক্ত করার জন্যে। ব্রিটিশরাজের বড়লাট সাহেব ও আধিকারিকদের পছন্দের গ্রীষ্মকালীন গন্তব্য ছিল দার্জিলিঙ। এছাড়াও ছিল চা বাগানের এক বিশাল সাম্রাজ্য। যা তখনকার দিনে মূলত ট্রেনের মাধ্যমেই সমতলে পৌঁছাত ও চলে যেত পৃথিবীর নানা প্রান্তে। দার্জিলিং চায়ের এই বিশ্বজোড়া খ্যাতির নেপথ্যে অবশ্যই রয়েছে ডি এইচ আর। এই রেলপথ চালু হয় ১৮৭৯ সালে। তার আগে এই দুর্গম ভূপ্রকৃতিতে এই কাজে নানা বাধা এসেছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতায়, অসংখ্য শ্রমিকের আত্মবলিদান, রক্ত-ঘামের ফল এই ডি এইচ আর। এটিকে কারিগরিবিদ্যার সর্বকালের এক অন্যন্য নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়।

ইঞ্জিনের বাঁশিতে আমার সম্বিৎ ফিরলো। ধীরে ধীরে ট্রেন এগিয়ে চললো ঘুমের উদ্দেশ্যে। রাস্তা কে আঁকিবুকি কেটে সে এগিয়ে চলছে নিজের ছন্দে, মৃদুমন্দ গতিতে। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলাম বাইরের দিকে। একদিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে টয়ট্রেন। অন্যদিকে রয়েছে রাস্তা, গাড়িগুলি আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সবার আকর্ষণ সেই টয়ট্রেন। স্বপ্নের রাজ্যে ছুটে চলেছি, মনে হচ্ছে। হালকা মেঘের আস্তরণ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে আর ঢেকে দিচ্ছে আমাদের এক মায়ার জগতে। সেই অদ্ভুত কুহেলিকা কেটে যাওয়ার পর আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি চারপাশের প্রকৃতির আপন মাধুরীতে তৈরি দার্জিলিং পাহাড়ের রূপ। আরেকদিকে ট্রেন ছুটে চলেছে ছোট ছোট বাড়ির উঠোন দিয়ে,বারান্দা দিয়ে; যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো পাহাড়ের মানুষগুলিকে। তাছাড়াও পাহাড়ি ফুলের গাছ মাঝেই মাঝেই তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে নিজের রূপের বাহার দিয়ে।

এসবের মধ্যে দিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়ালো বাতাসিয়া লুপে। এই রেলপথের অগুনতি লুপের মধ্যে অন্যতম ও সবচেয়ে বিখ্যাত হলো বাতাসিয়া লুপ। এইখানে রয়েছে সেনাবাহিনীর একটি স্মারক যা উৎসর্গ করা হয়েছে ১৯৭১ ও ১৯৯৯ এর অমর বীর জওয়ানদের যারা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন নিজের মাতৃভূমির উদ্যেশ্যে। স্মারকের গায়ে লেখা নামগুলো দেখে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেই হয়। মনে করতেই হয় তাদের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের, যাতে আমরা ঘুমোতে

পারি নিশ্চিন্তের ঘুম। চোখের সামনে জমতে থাকা অশ্রুধোঁয়া কে মুছে নেমে গেলাম পাশের সুন্দর সাজানো ফুলের বাগান। নানা প্রজাতির, নানা রঙের ফুলে সেজে উঠেছে এই জায়গাটি। চোখের পলকেই কখন যে সময় কেটে যাচ্ছিল খেয়াল নেই। ইঞ্জিন হর্ন দিয়ে সবাইকে আবার উঠে পড়ার সংকেত দিলো। এইবার আমরা এগিয়ে চললাম, বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে, ঘুম। নামে ঘুম হলেও বাস্তবে উৎসাহে আমার ঘুম ছুটছিলো। বাড়ির পাশ দিয়ে, বাজারের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে এসে

আমরা এসে দাঁড়ালাম ঘুম স্টেশনে। এককালে এই স্টেশন ছিল চা-ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু। মালগাড়িতে বিশ্ববিখ্যাত দার্জিলিং চা এখান থেকেই বোঝাই করা হতো। বর্তমানে সেই যুগ আর না থাকলেও সেই উদ্দেশ্যে তৈরি গুডস সাইডিং গুলো রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। স্টেশনটিও ধরে রেখেছে তার ব্রিটিশ সময়ের গথিক গঠনশৈলীর নিদর্শন। উপরে রয়েছে একটি সংগ্রহশালা। 'ডি এইচ আর' এর নানা সাক্ষ ও অমূল্য সম্পদ দিয়ে সাজানো এই সংগ্রহশালা। ঢুকে দেখতে পেলাম ব্রিটিশ সময় থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের নানা মুহূর্তের ছবি এই রেলপথকে কেন্দ্র করে। জানতে পারলাম দার্জিলিং হিমালায়ন রেলওয়ের আরো দুটি শাখা ছিল -- শিলিগুড়ি থেকে কিশানগঞ্জ ভায়া বাগডোগড়া, ও কালিমপঙ রোড বা গেইলেখোলা থেকে শিলিগুড়ি টাউন। দুটোই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যবসার সুযোগসুবিধার জন্য। গেইলেখোলা লাইনটি সিল্ক রুটের ব্যবসা বাণিজ্যকে আরো মসৃন করে তুলেছিল। কালিমপঙ থেকে এসে তিব্বতি জিনিসপত্র সোজা চলে যেত শিলিগুড়ি, যেখান থেকে চলে যেত কলকাতা সহ দেশের নানা জায়গায়। শোনা যায়, কবিগুরু শ্রী রবীন্দ্রনাথও এই ট্রেনে চড়েছিলেন কালিম্পঙের মংপু'র বাড়ি যাওয়ার পথে। কিন্তু ৭০ এর দশকের শেষের দিকে এক বিধ্বংসী বন্যায় পুরো লাইনটি চলে যায় তিস্তার করালগ্রাসে।

এছাড়াও রয়েছে প্রচুর ডাকটিকিট, টাইমটেবিল, অমূল্য পুঁথি ও কাগজ। তারপরের অংশে দেখতে পেলাম রেলের নানা কার্যনির্বাহী জিনিসপত্র যেমন সিগন্যালিং, ট্র্যাক, স্লিপার, ঐতিহাসিক ঘড়ি, পুরোনো টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যন্ত্র। শেষে খাতায় এই দারুন অভিজ্ঞতা ও সংরক্ষিত জিনিসের বৈচিত্রের তারিফ করে বেরিয়ে এলাম। নীচে দর্শন হলো শতাব্দিপ্রাচীন এক ছোট ইঞ্জিনের সাথে। তার নাম 'Baby Sivok'। ইঞ্জিনটির এই ক্ষুদ্র আকারেও অনায়াসে যাত্রী ও মালগাড়ি পরিবহন করতো ভেবেই স্তম্ভিত হলাম। স্টেশনটিতে আরো কিছু ছবি তুলে উঠে পড়লাম ট্রেনে। এবার ফেরার পালা। যদিও এইবার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বিষণ্ণতা মনকে গ্রাস করছে। ঘুম স্টেশন কে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে না করলেও, মানুষ বাধ্য তাঁর সময়সূচিতে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ,বারবার ফিরে আসবো এই মাটিতে , মনের শান্তি ও প্রানের আরাম খুঁজে নিতে।

ট্রেন ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল দার্জিলিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে। এবার ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব উঁকি মারছেন মেঘের ফাঁক দিয়ে, পড়ন্ত বেলার আলো নিয়ে। বাতাসিয়া ঢুকতেই চোখ আটকে গেলো দূরে। ওই দূরে কি যেন চকচক করছে। আমার উদ্বেলিত মনকে সত্যি প্রমান করে পাহাড়ের রানী 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সবাইকে অভিবাদন জানালেন, স্বাগত জানালেন ও সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে উধাও করে দিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবলোকন করতে থাকলাম প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ। সাদা পাহাড়ের মাথায় যেন গলানো সোনা ঝকঝক করছে। এ জন্যই বোধহয় দার্জিলিং এর প্রতি ভ্রমণপিপাসুদের এই অমোঘ টান। প্রকৃতি ও হিমালয়দেবের এই অপার সৌন্দর্য এর সাক্ষী হয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম দার্জিলিং স্টেশনে।

এক রাশ মুগ্ধতা, এক গুচ্ছ স্মৃতি ও একটু মন খারাপ নিয়ে সে বারের মতো বিদায় জানালাম দার্জিলিং হিমালায়ন রেলওয়েকে। পরদিন সন্ধেয় যখন 02346 সরাইঘাট এক্সপ্রেসে উঠছি বাড়ি ফেরার উদ্দেশে, মনে তখনো ভরপুর এই ছোট ট্রেনের স্মৃতি, অসংখ্য গল্প ও এক রাশ আনন্দ।

কলকাতায় ফিরে এসেছি অনেকদিন, কিন্তু রোজকার রোজনামচায় মাঝে মাঝেই ডাক দেয় সে, মনে করায় কু ঝিক ঝিক ধোয়া উড়িয়ে ছুটে চলা রেল, ট্রেনকে কেন্দ্র করে খেটেখাওয়া কিন্তু সদাহাস্য মানুষের মুখগুলি। নিজেই নিজেকে কথা দিয়েছি, আবার যাবো। হারিয়ে যাব পাহাড়ের কোলে, স্টিম ইঞ্জিনের বাঁশিতে কিংবা বাতাসিয়া লুপের সেই ফুলগুলির মাঝে।

সমস্ত ছবি সমূহ অনমিত্র বোস এবং প্রেয়া চক্রবর্তীর সৌজন্যে।।

বোম্বাই মেল

১৮৭৪ সালের এক ইউরোপীয় অভিযাত্রীর ডাইরি থেকে আমাদের অতিপরিচিত বোম্বাই-হাওড়া মেল অধুনা মুম্বাই মেলের প্রারম্ভিক যুগের যাত্রাপথের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এবং তৎকালীন কিছু সংবাদপত্র প্রতিবেদনেও বেশ কিছু তথ্য সমৃদ্ধ লেখনী পাওয়া গেছে। এই সকল তথ্য একত্রিত করার সময়সাধ্য কাজটি লেখক অতি নিপুন ভাবে করেছেন।

- প্রশান্ত কুমার মিশ্র

১৮৫৩ সালে, ভারতে রেলপথের যাত্রা শুরুর পরপরই লর্ড ডালহৌসির বক্তব্য ছিল যে ভারতীয় উপনিবেশের প্রধান প্রধান শহরগুলির সঙ্গে তৎকালীন রাজধানী কলকাতার জরুরীভিত্তিতে উন্নত রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসকদের যে জিনিসটার অভাব সবচেয়ে বেশি বোধ হয়েছিল তা হলো রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। বোম্বে প্রেসিডেন্সী আর সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্সীর থেকে সেনাবাহিনীকে এলাহাবাদের উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রুত পৌঁছে দেবার উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব ব্রিটিশদেরকে মারাত্মক ভুগিয়ে ছিল। বিদ্রোহের আগুন শান্ত হবার পর, তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় GIPR (The Great Indian Pennisular Railway company) লাইনের সাথে EIR (East Indian Railway company) এর লাইন জোড়ার কাজ শুরু হয় এবং ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়।

আগে কলকাতা থেকে বোম্বাই যাবার উপায় ছিল হয় এক সমুদ্রপথে, জাহাজে চড়ে যাতে প্রায় ১৫ দিন মত সময় লাগত। নয়তো বা সড়ক পথে পালকিতে বা ঘোড়ায় চড়ে বা হেঁটে যাতে প্রায় দু'মাসের ওপর সময় লাগত। কিন্তু রেলপথে যোগাযোগের ফলে দুই শহরের মাঝের ১৪০০ মাইল যাত্রাপথ মাত্র ৬৮ ঘণ্টায় অতিক্রান্ত করা সম্ভব হয়ে পড়লো। প্রথমে বোম্বাই থেকে প্রতিদিন দুপুর একটায় ছেড়ে একটি মেল ট্রেন তিনদিন তিনরাত পরে সকাল সাড়ে নটায় হাওড়া পৌঁছত।

এই লাইন চালু হবার কিছুদিন পরেই জব্বলপুরে, এক আলোচনা সভায় EIR এবং GIPR কোম্পানির আধিকারিকরা একত্রে বসেন। সভায় ঠিক হয় যে ১৮৭১ সালে, মধুপুর থেকে লক্কিসরাইয়ের মধ্যে কর্ড লাইনের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বোম্বাই-হাওড়া মেল ট্রেনের সময়সূচীর পরিবর্তন করা হবে। তখন মেল ট্রেনটি দুপুর একটার বদলে দুপুর বারোটায় ছেড়ে তিন দিন পর সকাল পাঁচটার সময় হাওড়া পৌঁছবে। এরফলে ১৯৭১রের পয়লা নভেম্বর, কর্ড লাইন চালু হবার পর তিন ঘন্টা সময় সাশ্রয় হয়ে সমগ্র যাত্রাপথের সময় কমে দাঁড়ায় ৬৫ ঘন্টায়। এবং সেটা পরে আরও কমে যায়, যখন জব্বলপুর থেকে বোম্বাইয়ের মাঝে তৈরি হওয়া নতুন অংশগুলির একত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়।

তৎকালীন যুগে এটিই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে দুরপাল্লার এবং দ্রুততম

এক্সপ্রেস ট্রেন। যারমধ্যে ৬১৩ মাইল পথ (বোম্বাই থেকে জব্বলপুর) ট্রেনটি যেত GIPR দিয়ে আর বাকি ৭৯৬ মাইল (জব্বলপুর থেকে কলকাতা ভায়া এলাহাবাদ) যেত EIR এর লাইন দিয়ে। গড় ২৪ মাইল গতিতে অর্থাৎ প্রায় ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় চলতো এই মেল ট্রেন। যারমধ্যে EIR এর রাজাবাঁধ থেকে বর্ধমানের মধ্যে গাড়ির গতি থাকত সর্বোচ্চ ৫৬ কিমি বা ৩৫ মাইল। ওদিকে GIPR এর লাইনে কারজাট থেকে কল্যানের মধ্যে গাড়ি যেত ৪৫ কিমি গতিতে।

টাইমস ম্যাগাজিনের এক সংবাদদাতা এই লাইন চালু হবার পর এতে যাত্রা করেন আর এই সম্বন্ধে একটি রিপোর্টে লেখেন, যে তিনি ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগতির যাত্রীবাহী ট্রেনে চড়ে বোম্বাই আর কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করেছেন। গোটা যাত্রাপথের ব্যাবস্থাপনা তার নিখুঁত বলেই মনে হয়েছে। EIR এবং GIPR দুটো লাইনেই ট্রেনের গতিবেগ ছিল গড় ৪০ কিমি এবং গাড়ি তার পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী মেনেই চলেছে। যাত্রাপথে বিরতির স্টেশনগুলিতে জলযোগের ব্যবস্থাও বেশ ভালো ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সচেতন যাত্রীরা নিজেদের খাবার নিজেরাই বহন করে, এই ব্যবস্থা সহজেই এড়িয়ে চলতে পারেন।

ভারতীয়দের অবশ্য এটি চিরকালীন রীতি যে যাত্রাকালে তারা নিজেদের রসদ নিজেরাই বহন করতে অভ্যস্ত। এর কারণ মূলত দুটি। যার প্রথম হলো পয়সার সাশ্রয় এবং একইসাথে সাস্থসচেতনতা। অতএব বেশিরভাগ যাত্রীর সাথে ডিমসিদ্ধ, ফল, কলা, পাউরুটি, মাখন, নুন-গোলমরিচ ইত্যাদির সাথে অবশ্যই থাকত জলের বড় পাত্র।

তিনি আরও লিখেছিলেন যে তার মনে হয়েছে যদিও দুই রেলেরই প্রথম শ্রেণী বা ফার্স্ট ক্লাস এর কামরাগুলি বেশ আরামদায়ক এবং যাত্রী সাচ্ছন্দের দিক থেকে উচ্চমানের। কিন্তু তার ব্যক্তিগত ভাবে EIR এর থেকে GIPR এর ট্রেনের কামরাগুলি তুলনামূলক ভাবে বেশি আরামদায়ক মনে হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি প্রথম শ্রেণীর তুলনায় বেশি ঠাণ্ডা এবং ভাড়াও অর্ধেক। কিন্তু ভারী মালপত্রের মাসুলের হার বেশ চড়া। কিন্তু এখানেও তুলনায় EIR এর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি যাত্রী সাচ্ছন্দের দিক থেকে যোজন পিছিয়ে আছে। তার এও বক্তব্য ছিল যে, যদি EIR এর দ্বিতীয় শ্রেণীগুলি গুনমানের দিক থেকে GIPR এর অর্ধেকও হতো তাহলেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব যাত্রীদের তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করার উপদেশ দিতেন।

তার আরও সংযোজন যে দিনকে দিন যাত্রীহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রেল কোম্পানিরাও নিজেদের ব্যবস্থাপনা সেই ভিড়কে সামাল দেবার উপযুক্ত করে তুলেছে। তার মতে, নতুন ধ্যানধারনা পরিপন্থী এবং নবপ্রযুক্তি অথবা পশ্চিমি ভাবধারা কে যাচাই করে আপন করে নিজেকে উন্নত করার নিরিখে ভারতীয়রা জাত-ধর্ম নির্বিশেষে কঠিনতম জাতি। তারা সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সেই জাতির রেলের প্রতি অসীম আগ্রহ এবং অনুরাগ দেখে এই ভ্রম হতে বাধ্য, যে রেল যেন এই উপমহাদেশে সেই প্রাচীনকাল থেকেই আছে বা ছিল। এখন শুধু তা নিজের প্রসার বিস্তার করছে।

বোম্বাই-কলকাতা যাত্রাপথের ইতিকথা

১৮৭৪ সালে একজন ইউরোপিয়ান পর্যটক তাঁর ডায়েরিতে এই যাত্রাপথটি অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত করেছেন। তাঁর ব্রিটিশ এবং আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় রেলভ্রমনের অভিজ্ঞতা ছিল। এবং তাই ভারতীয় উপমহাদেশে রেলের নবযুগের সন্ধিক্ষনের সাক্ষী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

জাহাজে করে যে সকল কলকাতা অভিমুখী যাত্রীরা সকাল সকাল বোম্বাইতে এসে পৌঁছতেন মূলত তাঁদের সুবিধার্থেই কলকাতার ট্রেন ছাড়ার সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছিল। এতে হোটেল ভাড়ার সাশ্রয় হতো। কিন্তু যারা শহরে থেকে বিশ্রাম নিতে চান তাদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থাও প্রচুর ছিল। ইউরোপিয় পর্যটকদের জন্য বোম্বাই এবং কলকাতায় থাকার হোটেল হিসেবে গাইডবুকগুলিতে সর্বদাই নির্দিষ্ট দুটো নাম দেওয়া থাকত তা হলো যথাক্রমে এসপ্ল্যানেড হোটেল এবং গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। বোম্বাইয়ের ওয়াটসন'স এসপ্ল্যানেড হোটেলটি জাহাজঘাটা আর রেল স্টেশনের ঠিক মাঝে অবস্থিত

ছিলো। এখান থেকে অ্যাপোলো বন্দর কাছাকাছির মধ্যেই পড়ে, যেখানে সমস্ত জাহাজ কোম্পানির অফিস ছিল। এবং বড় বড় মার্চেন্ট অফিস, অন্যান্য দরকারি বা প্রশাসনিক কাজের জায়গাগুলিও কাছেপিঠের মধ্যেই ছিল। GIPR এর যাত্রীদেরকে হোটেল থেকে সরাসরি পরিচারক সহ গাড়িতে করে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একইভাবে BB&CI (Bombay, Baroda & Central Indian Railway company) এর যাত্রীদেরকে চার্চগেট স্টেশন অবধি পৌঁছে দেওয়ারও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

১৮৭৪ সালে, ফেব্রুয়ারি মাসের পয়লা তারিখ, রবিবার বাইকুল্লা (Byculla) থেকে ১০টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করেন এই পর্যটক। আধঘন্টা বাদে একটি ব্রিজ অতিক্রম করে ট্রেন সালসেট (Salsette) দ্বীপ ত্যাগ করে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। লাইনের একপাশে এবড়োখেবড়ো মাটিপাহাড়ের স্তূপ অন্যপাশে নোনাজলের নদী-মোহনার সন্নিবেশ এবং তার মাঝে মাঝে গাছপালায় ভরা ব-দ্বীপের সমাহার। ট্রেন বিচিত্র সব ছোট ছোট পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে যাদের অধিকাংশেরই চুড়ো ভাঙা এবং অত্যাশ্চর্যকর আকার ধারণ করে আশপাশের রুক্ষ প্রকৃতির শোভাবর্ধন করেছে। আরও আধঘন্টা পর ৩৩ মাইল পথ অতিক্রান্ত করে ট্রেন দাঁড়ালো কল্যান (Callian) স্টেশনে। সেখানে ইঞ্জিন পরিবর্তন করে, সামনের পাহাড়ী পথের জন্য উপযুক্ত, ছয়-চাকার ভারী ইঞ্জিন লাগানো হলো। কারণ এরপর থেকেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার শুরু। কল্যানের পর থেকেই খাড়া চড়াই আরম্ভ হলো। চারপাশের প্রকৃতি ক্রমে শ্যামলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশের বন্য প্রকৃতি পর্যটকদের কাছে নিজের অপরূপ শোভা উজাড় করে দেয় যেন। অধিকাংশ গাইডবুকগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সফর দিনমানে করার পরামর্শ দিয়ে থাকতো তার প্রধান কারণ ছিল এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা। দূরে মিলিটারির জন্য তৈরি, একটা সরকারী রাস্তাও দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

এরপর আসে কসারা। এখানে ট্রেনের পেছনে চারটে করে ব্রেক ভ্যান লাগানো হতো যার

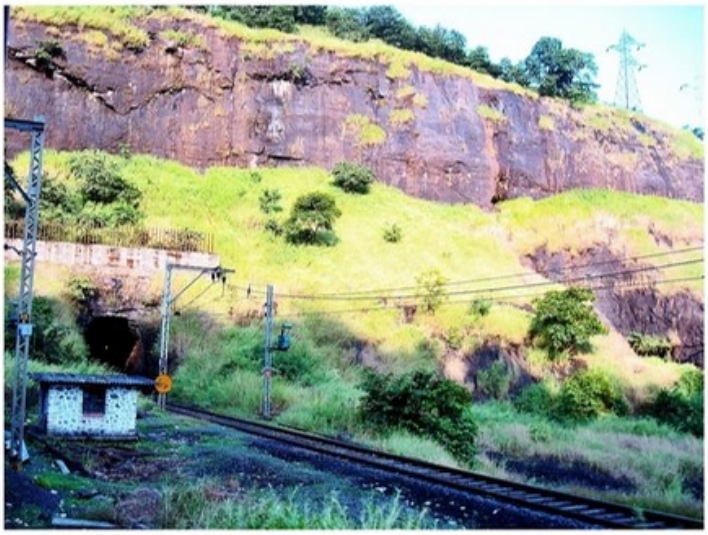

এক একটার ওজন ছিল ১০ টন। এই গাড়িগুলি মুলত সামনের চড়াই-উতরাইতে ট্রেন যাতে পিছলে না যায় বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গতিবেগ না হয়ে যায় তার জন্য কাজে লাগানো হতো। ইঞ্জিন এবং তার সাথে এরকম চারটে কামরা মিলে যা ওজন হতো তা প্রায় গোটা ট্রেনের ৪০ শতাংশ। এই উদ্ভট ব্যবস্থাপনাকে অত্যন্ত লেখকের অবশ্য বেশ হাস্যকর এবং আনাড়ি চিন্তাধারার বলে মনে হয়েছে। তাঁর মতে, এর থেকে সহজ এবং উন্নত উপায় হলো আমেরিকার মত এখানেও ট্রেনের প্রতিটা কামরায় যদি একটা করে ব্রেক লাগানোর সংস্থান করা যায় তাহলে এই জবড়জং ব্যবস্থা থেকে অচিরেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

ট্রেন এরপর থলঘাট (Thull Ghat) পর্বতের গা বেয়ে উঠতে লাগে। সিকিভাগ পথ অতিক্রান্ত করে, তিনটি ছোট ছোট সুড়ঙ্গ পার করে, রিভার্সাল করার জায়গায় এসে থামে। এখানে একটি Y-siding আছে যেখানে ট্রেনের ইঞ্জিন আর ব্রেকভানের দিক পরিবর্তন করা হয়। এটাই সেই জায়গা যেখান থেকে কিছু বছর আগে একটি ট্রেন আচমকা গড়াতে শুরু করে ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে প্রায় ১১০ কিমি গতিতে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ৭০ ফুট নিচে আছড়ে পরে এবং প্রায় সব যাত্রীর মৃত্যু হয়।

এখান থেকে থল ঘাটের উচ্চতম জায়গাতে (১৯১২ ফুট) পৌছনোর পথে সবসুদ্ধ মোট ১৩টি সুড়ঙ্গ পরে যারমধ্যে দীর্ঘতম সুড়ঙ্গটি প্রায় সাড়ে চারশো মিটার লম্বা। এই থল ঘাট, রেলপথে প্রায় ১৫ কিমি চওড়া। পথে প্রায় ২১টি সেতু পড়ে যার বেশিরভাগই ৭ থেকে

৩০ ফিট মত লম্বা কিন্তু সবচেয়ে বড় সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ফিট। এরমধ্যে একটি প্রায় ২৮৬ ফিট গভীর গিরিখাতের ওপর অবস্থিত। এই দুইটি সেতুতে ওয়ারেন কোম্পানির তৈরি করা ১৫০ ফিট চওড়া, ৩২ টন ওজনের স্টিলের গার্ডার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও পথে পড়বে প্রায় ৬২টি কালভার্ট।

প্রায় পৌনে তিনটের সময় ট্রেন পাহাড় থেকে নেমে সমতলে প্রবেশ করলো এবং এর কিছু পরেই ইগাটপুরিতে (Equtpoora) এসে দাঁড়ালো। এখানে ব্রেকভ্যান গুলি খুলে নেওয়া হয়। তারসাথে এখানে আবার একবার ইঞ্জিন পরিবর্তন হয়। মূলত এটি Deccan মালভূমির ওপর অবস্থিত এবং পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাছে দূরে রুক্ষ প্রান্তরে বিভিন্ন আকারের আগ্নেয়শিলা যে রোদে-জলে ক্ষয়ে গিয়ে কিছু অদ্ভুত নয়নাভিরাম আকার ধারণ করেছে যেমন কোনোটা পেল্লায় থামের মত কোনোটা আবার একটা আস্ত কেল্লার মত দেখতে মনে হয়। যাইহোক গাড়ি আবার চলতে শুরু করে আর কিছু পরেই চারপাশে পাহাড়ের চিহ্ন কমতে আরম্ভ করে এবং নন্দগাও (Naudgaum) পৌছনোর আগেই একবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়। ট্রেন ক্রমে আরও সমতলের দিকে এগিয়ে চলে এবং চারপাশের মাটির উর্বরতাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে কিছু গভীর নদীখাত চোখে পরে। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ট্রেন গিয়ে পৌছোয় চল্লিসগাওতে (Chalisgaum), এখানেই যাত্রীদেরকে ডিনার পরিষেবা প্রদান করা হয়। GIPR এর খাবারের পরিমান এবং গুনমান দুই বেশ ভালো এবং যাত্রীদের দ্বারা প্রশংসিত। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী তৎকালীন ভারতের বাকি রেল কোম্পানির তুলনায়, GIPR এর ডিনার/লাঞ্চ পরিষেবা যথেষ্ট উন্নতমানের এবং সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত। ভারতে এসে বেশীরভাগ বিদেশী পর্যটকরা সোডা জল খেয়েই থাকার চেষ্টা করতো। কেউ কেউ তাতে আবার একটু ব্র্যান্ডিও মিশিয়ে নিত। লেখকের কথায়, "কোন পানীয়টা খাবো আর কোনটা খাবো না সেটা ঠিক করা খুবই শক্ত ব্যাপার। এখন শীতকালে বলে অতটাও চিন্তা নেই। কিন্ত ভারতের প্রখর গ্রীষ্মের সময় মারাত্মক ঘামের দৌলতে অবধারিত ভাবে আপনাকে ঘন ঘন তেষ্টা মেটাতেই হবে। এবং বিপদটা ঠিক তখনই। ঠাণ্ডা চা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। লেমনেড বা শুধু সোডাজল খেতে ডাক্তাররা বারন করেন কারণ ওগুলো রক্ত পাতলা করে। বিয়ার বা ওয়াইন ওই গরমে শরীরের পক্ষ্যে যথেষ্ট ভারী জিনিস। অতএব বাকি থাকছে ব্র্যান্ডি সহযোগে সোডা জল যেটা হালকা এবং সাস্থ্যকর আর পিপাসাও মেটাবে। যাঁদের আবার এসব চলে না তাঁরা অবশ্য বোম্বাই বা কলকাতা থেকে জল বহন করে থাকেন।"

পরের স্টেশন ভুসাভাল (Bhosawul) আসে রাত দশটার সময়। ট্রেন এরমধ্যে চারশো চুয়াল্লিশ কিমি পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। এই স্টেশনে লেখক বেশ মজার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। মূলত ইংরেজ যাত্রীরা রাত্রিবেলা সাচ্ছন্দে শোয়ার ব্যবস্থা করতে এলাহি আয়োজন আরম্ভ করতো। প্রথমেই তারা সারাদিনের ব্যবহৃত পোশাক যেমন কোট, ওয়েস্ট কোট, প্যান্ট বা ট্রাউজার ইত্যাদি খুলে সযত্নে রেখে দিত পরের দিন ব্যবহারের জন্যে। তারপর একটা পাতলা জামা, সঙ্গে হাল্কা পাজামা এবং একটা পাতলা জ্যাকেট বের করে ফেলত রাতপোশাক হিসেবে। এরপরে তারা তাদের নির্দিষ্ট সোফা বা বেঞ্চে বিছানা পাততো, যারমধ্যে আবসস্যাবি ভাবে দু-তিনটে ছোট বালিশ, একটা চাদর, এবং একটা বা দুটো কম্বল থাকবেই। বিছানা করা হয়ে গেলে তাতে বসে নিজের বানানো ব্র্যান্ডিটুকু শেষ করবে। এরপর আধশোয়া হয়ে গায়ে একটা ওভারকোট বা কম্বল চাপিয়ে নিজের সঙ্গতি অনুযায়ী চুরুট বা সিগারেট ধরাবে। এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেটি শেষ হবার আগেই তারা ঘুমের দেশে পাড়ি দেবে।

ট্রেন ভুসাভাল ছেড়ে এগিয়ে চলে এবং তাপ্তি (Taptee) নদী পার করে জঙ্গলের পথে প্রবেশ করে। এই জঙ্গল তখন তাপ্তি থেকে নর্মদা (Nerbudda) অবধি প্রায় সাড়ে তিনশো কিমি বিস্তৃত ছিল। পরের দিন ভোরবেলা বেশ ঠাণ্ডা সত্ত্বেও সব যাত্রীরা নর্মদা নদীর সুদূরপ্রসারী নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার তাড়নায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। গঙ্গার পরে নর্মদাকেই ভারতের দ্বিতীয় পবিত্রতম নদী আখ্যা দেওয়া হয়। ট্রেন নর্মদা পেরিয়ে কিছুদুর গিয়ে সোহাগপুরে গিয়ে দিনের প্রথম প্রাতরাশ খাবার জন্য থামে।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা যেখানেই থাকুন না কেন এটা একটা সর্বজনীন রীতি, যে তাঁরা সাধারনত খুব ভোরে ওঠেন। দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে উঠে পড়ার এই প্রথাটির মূল কারণ হল ভোরে হাঁটার অভ্যেস এবং তারসাথে লোভনীয় সব জলখাবার যাকে একধরনের প্রাথমিক বা ছোট প্রাতরাশও বলা হয়ে থাকে। এই রেওয়াজের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এরকম ব্যবস্থাই করেছেন যে দিনের আলো ফোটার কিছু সময়ের মধ্যেই যাতে ট্রেন কোন স্টেশনে এসে দাঁড়াবে এবং যাত্রীরা চাহিদামত জলযোগ করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপিয়ান পর্যটকরাও এই রীতির ফায়দা নিতে পারেতেন। বিশেষত গোটা এক রাত ভারতীয় রেলের কামরায় কাটানোর পর এটি একটি অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক অবকাশ বলা যেতে পারে। ট্রেন থামার সাথে সাথে বিচিত্র সব রাতপোশাক পরিহিত ইংরেজ যাত্রীদেরকে খাবার হলের দিকে দৌড়োতে দেখা যেত, যেখানে তাদের জন্য গরমাগরম চা/কফি, ডিমসেদ্ধ, মাখন পাউরুটি ইত্যাদি অপেক্ষায় আছে। এমনকি মহিলারাও রাতপোশাকের ওপর কোনক্রমে প্রসাধন করে, চুল-টুল বেধে এমন ভাবে তৈরি হয়ে আসেতেন, যে দেখে মনে হত যেন ইংরেজ অন্দরমহল থেকে সবে বেরলেন। জলখাবারের হলের ছবিটা স্বভাবতই চঞ্চলতার। সবাই যে যার খাবার গোগ্রাসে গলাদ্ধকরনে ব্যাস্ত। তুলনায় পরিমানের অধিক খাইয়ে যারা, তাদেরকে এই রেস্তোরাগুলির পরিচালকেরা যথেষ্ট খাতির করে কিন্তু তার সাথে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতেও এরা সিদ্ধহস্ত। এরা তাদের লাভের মোটা অঙ্ক সাধারনত চা/কফি দিয়ে

পুষিয়ে নেয়। যার ফলে এই পানীয় গুলি অত্যন্ত বিস্বাদ হয়। স্থানীয় যাত্রীদেরকেও তাদের কামরা থেকে নেমে এসে ফল-মিষ্টি দিয়ে প্রাতরাশ সারতে দেখা যায়। সর্বাঙ্গ চুলকানো তাদের একটা বাতিকের মধ্যে পরে কিন্তু তার আসল কারণ ট্রেনের ছারপোকা হতে বাধা নেই। মিনিট দশেক দাঁড়ানোর পরে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা শোনা যায়। হলের মধ্যে যাত্রীদের মাথাপিছু এক বা দু টাকা সংগ্রহ করার হুড়োহুড়ি পরে যায়। অতঃপর ট্রেন ফের তার গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়।

এদিকে এই দশমিনিটের বিরতির মধ্যেই রেল কর্মচারীরা প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলি পরিস্কার করে দেন। ট্রেন ছাড়ার পরেই আরেকটা দেখবার মত দৃশ্য শুরু হত এই কামরাগুলির ভেতরে। জলখাবারের সময় যদিও বা রাতপোশাকেই কাজ চালানো হয়ে থাকে কিন্তু তাই বলে সারাদিন ওই পোশাক পরে থাকা ইংরেজ শিষ্টাচার বিরুদ্ধে। তাই ট্রেন ছাড়ার সাথে সাথে বিছানা বালিশ সব গোছানো হয়ে যায়, রাত পোশাক ব্যাগে ঢুকে পড়ে; সাবান, শ্যাম্পু, রেজার, চুলের ব্রাশ ইত্যাদি সব বেরিয়ে পড়ে আর সবাই এক এক করে স্নানের কামরায় গিয়ে ফিটফাট সেজে বেরোন। এবং পরের আধ ঘন্টার মধ্যে এই সমস্ত প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের দেখে মনে হতে বাধ্য যে তারা কেবলমাত্র লন্ডন থেকে ব্রাইটনের মধ্যে সফর করছেন।

ট্রেন ছাড়ার পর থেকে প্রথম ঘণ্টা দুই তিনেক এই সুন্দর পোশাক পরিহিত যাত্রীদের বেশ ভালো কাটে। দিনের এইটুকু সময় ভারতীয় রেলে ভ্রমণ করার সেরা সময় বলা যেতে পারে। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে সূর্যের তেজও বাড়তে থাকে। এবং সারারাতের জমা শিশির উবে গিয়ে শুরু হয় ধুলো। ইউরোপিয়দের কথা অনুযায়ী ভারতে রেল ভ্রমণের সময় যে পুরু ধুলোর ঝাপটা খেতে হয় সেরকমটা নাকি সারা বিশ্বে আর কোথাও মেলে না। লেখকের মতে, "ধূলিকণাগুলি মোটেই সূক্ষ্ম নয় বরং সেগুলিকে ধুলো না বলে কাঁকর বলা চলতে পারে যা শরীরের সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় হানা দেয়। কখনো চুলের মধ্যে, কখনো চোখের মধ্যে কখনো বা নাক-কানের ভিতরে। সেগুলি আপনার মুখমণ্ডলকেও রেয়াত করে না এমনকি আপনার রোমকূপগুলিকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এই ধুলোর মধ্যে টানা দুঘন্টা যাত্রা করার পর, সবচেয়ে নম্র-ভদ্র মানুষটিও অভদ্র আচরণ শুরু করে দেবে, সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে আর সবচেয়ে মৃদুভাষী লোকও উচ্চস্বরে কটুকথা বলতে আরম্ভ করে দেবে।"

নর্মদা থেকে জব্বলপুর অবধি রেল লাইন মূলত সমতল ভুমির ওপর দিয়েই গেছে। চারপাশে যতদূর চোখ যায় দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত। মাঝে মাঝে কিছু এলাকা জুড়ে ঘন বন, বা কিছু কাঁটাঝোপ। কোথাও আবার ফলের বাগান বা শাক-সব্জির চাষ। চারিধারে শুধুই সবুজের সমাহার, তার বুক চিরে সজা চলে গেছে রেল লাইন – আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন। GIPR এর স্টেশনগুলিও চারপাশের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করা। কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির নিশ্চয়ই কখনো মনে হয়েছিল যে একটি রেল স্টেশন মানে তা শুধুমাত্র ইট-কাঠ-লোহা-পাথরের সমষ্টি হতে পারেনা। বরং একটু সৃজনশীল ভাবনা গোটা এলাকার ভোল পাল্টে দিতে পারে। এই ভাবনার প্রেক্ষিতে GIPR এর প্রতিটা স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়। যার ফলস্বরূপ এই লাইনের প্রতিটি স্টেশন, বাগান, ফুলের টব, প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। এবং তার নিয়মিত পরিচর্যাও করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বাতিল তেলের টিন বা আলকাতরার ড্রাম প্রভৃতিকেই ফুলের টব বা ঝুলনো ফুলের বাস্কেট হিসেবে পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। এতে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও কমছে কারণ চারপাশ পরিস্কার থাকছে। স্টেশনমাস্টাররা, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় বাসিন্দা, এই সাজানো গোছানোর কাজে বেশ উৎসাহ দেখাতেন। তাদেরকে প্রায়শই বাগান পরিচর্যার বই হাতে এলাকা পরিদর্শন করতে দেখা যেত। ফলে পয়েন্টস্ম্যান, কুলিকামিনদের কাজের অন্ত ছিলনা। তাদের খালি সময়ের অনেকটাই মাটি খোঁড়া, গর্ত করা, চারা লাগানো, সার বা জল দেবার কাজে দেখা যেত। এদের সবার মিলিত প্রয়াসেই কিন্তু GIPR এর স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকাগুলি সুন্দর এবং প্রাকৃতিক ভাবে সেজে উঠেছে। নয়তো উত্তর বা পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের স্টেশনের কথা ভাবলেই একধারে ডাই করে রাখা কয়লা, অন্য কোনে কাঠ-লোহার-বাতিল জিনিসের স্তুপ সঙ্গে ধুলো-ধূসরিত অপরিচ্ছন্ন চত্বরের ছবি উঠে আসে। কিন্তু এই লাইন এখানেই স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। কয়লা একধারে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা এবং কয়লার গুড়ো নিয়মিত সাফ করে ফেলা হয়। বাতিল লোহা বা কাঠ রং-টং করে বাগানের বা স্টেশনের বেড়া অথবা বাগানের চলার পথ হিসেবে কাজে লাগানো হয়। ঝকঝকে স্টেশনঘর গুলো সুন্দর ফুলের বা লতানে গাছের কেয়ারি দিয়ে সাজানো থাকে। এমনকি মালগুদাম গুলোকেও একইভাবে সাজানো হয়। প্ল্যাটফর্মের দেওয়াল গুলোতে ফুলের টব বা বাস্কেট ঝুলতে দেখা যায় কোথাও আবার দেওয়াল জুড়ে টব দিয়ে পিরামিড বানানো আছে। প্রায় সমস্ত বাতিল জিনিসই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এমনকি বাতিল সিগনালের তারগুলোকেও নানান কাজে লাগানো হয়। একসময় ব্যাপার এমন পর্যায় পৌছে ছিল, যে লোকো অ্যান্ড ক্যারেজ ডিপার্টমেন্ট কোনো জিনিস এমনি ফেলে রাখতে ভরসা করতো না। এরকমটা নাকি শোনা যায় যে প্রায় দুশোর ওপর তেলের খালি টিন নাকি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছিল বাতিল করার আগেই। কিছুদিন পরেই অবশ্য সেগুলোই আবার আত্মপ্রকাশ করে সুন্দর ফুলের টব হিসেবে। এই কৌতুকময় ঘটনাগুলি আখেরে পরিবেশের উন্নতিই করেছে এবং কোম্পানির অল্প খরচে একই সাথে পরিবেশ বেঁচেছে এবং এলাকাও পরিচ্ছন্ন থেকেছে। EIR প্রযুক্তিগত ভাবে বা ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে পারে কিন্তু যাত্রী সাচ্ছন্দ, পরিষেবা বা পরিবেশ সচেতনতার দিক থেকে GIPR সর্বত

ভাবে এগিয়ে আছে। লেখকের কথায়, "এদের স্টেশনগুলি ইংল্যান্ডের রেল স্টেশনের থেকেও সুন্দর বলে মনে হয়েছে আমার। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পরিস্কার ঝকঝকে ওয়েটিং হল এবং বাথরুমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়। রেলের কর্মচারীরাও কেতাদুরস্ত, সভ্য এবং নম্র। যাত্রীদের অভাব অভিযোগ মন দিয়ে শোনবার অভ্যেস ও মানসিকতা দুইই আছে তাদের। রেলপুলিশদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গোটা ব্যবস্থাটাই নিপুণ এবং দক্ষ পরিচালনার দিকেই ইঙ্গিত করে।

সাধারনত ১০টা নাগাদ আরেকপ্রস্ত প্রাতরাশ করার জন্য ট্রেন আরও একবার দাঁড়ায়। কিন্তু এবার খাবার হলের দিকে যাবার আগে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নেবার আশু প্রয়োজন আছে। এটা ছাড়া সাচ্ছন্দে খেতে বসা একপ্রকার অসম্ভব বলা চলে। এরপর বেলা দুটোর সময়, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রাতরাশের চারঘন্টা বাদে, ট্রেন লাঞ্চ খাবার জন্য প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়ায়। লাঞ্চের খাদ্যতালিকায় আশ্চর্যজনক ভাবে প্রাতরাশেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। তফাতটা শুধুমাত্র দামেই বোঝা যায়। সন্ধ্যেবেলা প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিনারের জন্য ট্রেন ফের এক ঘণ্টা থামে। ডিনারের খাদ্যতালিকার সঙ্গেও লাঞ্চ বা প্রাতরাশের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। শুধু সুপ ব্যাপারটা তালিকায় যোগ হয় এবং দাম আরও খানিকটা বেড়ে যায়। জব্বলপুর ঢোকার ঠিক আগেই পড়ে মদনমহল স্টেশন। সেখান থেকে তিন মাইলের মধ্যেই বিখ্যাত মার্বেল রক। এরপর জব্বলপুরে ঢোকার আগে ফের পাহাড় দেখা যায় কিন্তু পশ্চিমঘাটের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। জব্বলপুরেই GIPR রের লাইন শেষ। গাড়ির কামরা বদল করার সাথে সাথেই এলাহাবাদের দিকে যাত্রা আরম্ভ হয়। যারা সেই সময়ের রেল যাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাদের এটা জানা থাকবে যে ট্রেনের কিছু কামরা, যেমন প্রথম শ্রেণী বা কিছ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, গোটা পথ অতিক্রম করতো। এই কামরার যাত্রীদের সেক্ষেত্রে কামরা বদলের দরকার পড়তো না। এইধরনের কামরাগুলি তখন অপেক্ষারত ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। এই ব্যবস্থা বহুদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। EIR এ ঢোকার সাথে সাথেই GIPR রের সঙ্গে তফাৎ মালুম হতে থাকে। অপরিষ্কার স্টেশন, প্রায় প্রতিটা স্টেশনেই ট্রেনের দীর্ঘক্ষনের বিরক্তিকর বিরতি এবং শ্লথগতি। লাইন এখনো সমতলের ওপর দিয়েই এগিয়েছে। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো টিলা দেখা যায় কদাচিৎ। রাত দশটা নাগাদ যমুনা নদী পেরিয়ে এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছলো ট্রেন।

লেখক যদিও গোটা রাস্তা একই কামরায় যাত্রা করবার মতই ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু তাঁর কামরার মধ্যে হাওয়া চলাচল ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে এলাহাবাদে তাকে বাধ্য হয়ে কামরা বদল করতে হয়। তিনি লাহোর থেকে কলকাতাগামী একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসেন। EIR রের প্রথম শ্রেণীগুলি অন্যরকমের। এক একটা কম্পার্টমেন্টে দুটো বসার সোফা আর মাথার ওপরে দুটো শোয়ার বাঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। এতে করে একটি কম্পার্টমেন্টে মোট চারজন যাত্রী সচ্ছন্দে শুয়ে-বসে ভ্রমণ করতে পারেন। যদিও বিজ্ঞপ্তিতে লেখা থাকত যে মোট আটজন যেতে পারেন একটা কম্পার্টমেন্টে। এই কামরাগুলির মধ্যেই ছোট একটা বাথরুমও থাকে এবং সেটার মাথার ওপরের ট্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় জলের বন্দোবস্ত করা থাকতো। কিন্তু EIR রের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলি প্রায়শই ফাঁকা যায়। তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেনীতে ভিড় হয় বেশি। বিনামুল্যের টিকিটপ্রাপ্ত সৈন্যরা, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পরিচারকরা বা সরকারি কেরানীরাই দ্বিতীয় শ্রেনীতে বেশি সফর করতেন। এর ভাড়াও অর্ধেক। মাঝে মাঝে ভারতের উচ্চবর্ণের মানুষেরা সপরিবারে ভ্রমণের জন্য গোটা দ্বিতীয় শ্রেনী বুক করতেন। বাকি তামাম যাত্রীর ভরসা তৃতীয় শ্রেনীতে। এর ভাড়া সব থেকে কম। অত্যধিক ভিড় হত এই কামরাগুলিতে। মরসুম বা উৎসবের সময় ভেতরে দম ফেলার জায়গাও থাকতো না। এবং এই নিয়ে বিশেষ হেলদোলও দেখা যেত না। এই দুর্বিষহ অবস্থাতেই তাঁরা মাইলের পর মাইল যাত্রা করে অভ্যস্ত। এই কামরাগুলি থেকেই রেল কোম্পানির সব থেকে বেশি আয় হত এবং সেই কারণে যেকোনো ট্রেনে সব থেকে বেশি তৃতীয় শ্রেনীর কামরা থাকত। যাত্রীরাও বেশ মজাদার ধরনের। প্রায়শই দেখা যেত যে, একটি তিন বা চার জনের পরিবার বিরাট লটবহর নিয়ে ট্রেনে চাপত। এবং কি থাকতো না তাদের সাথে – জামাকাপড় তো বটেই তারসাথে অবধারিত ভাবে একটা খাটিয়া, তার বিছানা, বিরাট এক বোঝা আঁখ, এক বস্তা চাল, সমপরিমান ডাল এবং আটা, সঙ্গে প্রায় দশ-পনেরো কিলো ঘী। মূল উদ্দেশ্য নতুন জায়গায় খাবারের খরচ বাঁচানো। এরজন্য মাশুল দিতে হলেও তারা পিছপা হতো না।

যাইহোক, এদিকে আধঘন্টা বাদে, রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন এলাহাবাদ ছাড়ল এবং ফের যমুনা নদীর ব্রিজ পার করে, অন্য রাস্তা ধরলো। পরের দিন সকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা ছিলো। সঙ্গে বেশ কুয়াশা। সমতল উর্বর জমির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। খরা কবলিত এলাকার রেল স্টেশনগুলিতে প্রচুর শস্যদানা ভর্তি বস্তা দেখা যেত যা গরুর গাড়িতে করে বা মোষের পিঠে করে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছনো হতো। এই পথে ডাবল লাইনের কাজ বহু আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। ভারতের সমস্ত রেললাইনের পাশে পাশে একটা জিনিস অবশ্যই দেখা যাবে, তা হলো টেলিগ্রাফের তার। মাইলের পর মাইল জুড়ে এই তার বিছানো আছে। ট্রেন প্রথমে দানাপুরে (Dinapore) কিছুক্ষন থেমে ৭.৫০ মিনিটে পাটনায় পৌছলো। পাটনা ছাড়ার পরে পরেই গঙ্গা নদীর এক ঝলক দেখা পাওয়া যায়। এরপর সাড়ে নটার সময় ট্রেন মোকামাতে (Mokameh) পৌছে আধঘণ্টা জলযোগের বিরতি দেয়।

স্টেশনের বাইরে বহু মানুষের জমায়েত লক্ষ্য করা যায়। এটি উত্তর ভারতের বিহার (Behar) অঞ্চলের এক মজাদার রীতি। যখন কোনো গ্রামের বা মফঃস্বলের কোন কেউকেটা ব্যক্তি রেলসফরে বের হন, তাঁকে ট্রেনে তোলার জন্য অন্তত শ'খানেক লোক

সঙ্গে আসতো। সকালে বা বেলায় ট্রেন থাকলেও তারা সকাল ছটার মধ্যে স্টেশনের বাইরে উপস্থিত হয়ে যায়। এবং সেখানেই খাটিয়া পেতে বসে আঁখ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি খেতে খেতে গল্প জুড়ে দেয়। আর একটা ট্রেনে এরকম একজন কেউকেটাই যাত্রা করছেন সেরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। হিসেব করলে দেখা যাবে এরকম প্রায় তিন-চারশো লোক হয়তো রোজ কোন না কোন ট্রেনে চাপছেন। এবং তাঁদের ট্রেনে তুলতে লাখ খানেক মানুষ বিভিন্ন স্টেশনের বাইরে তিন-চার ঘন্টা আগে থেকে ভিড় জমিয়ে ফেলেন। তাদের চিৎকার, হইচইতে পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। বাকি যাত্রীদের বিরক্তির সীমা থাকেনা। কিন্তু এই লোকেরা নির্বিকার ও নিরুত্তাপ ভাবে তাদের কাজ করে যায়। এদের মধ্যে যারা ট্রেনে উঠবেন তারা আবার টিকিট কাটার লাইনে ঝগড়া বাধিয়ে দেন যা মাঝেমাঝে হাতাহাতি অবধিও গড়ায়। এরপর ট্রেন ছাড়ার সময় হলে সবাই মিলে কামরা খোঁজার তাগিদে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয়। বাইরে যারা অপেক্ষা করছিল তারাও বিদায় জানাতে প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে। এর ফাঁকে কেউ দলছুট হয়ে পড়লে তাকে অন্যরা গলা ফাটিয়ে ডাকতে থাকে। বিভিন্ন লোকের নাম ধরে বহু লোক এক সাথে ডাকতে শুরু করে। সব মিলিয়ে ট্রেন ছাড়ার সময় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এবং এই হট্টগোল সামলানোর মত উপযুক্ত পরিকাঠামো EIR এর ছিল না।

মোকামা থেকে মধুপুরের (Muddapur) মধ্যের অঞ্চলগুলি বন্যাপ্রবণ হওয়ার কারণে রেললাইন মাটি থেকে ১৫-২০ ফুট উচুতে পাতা হয়েছে। মাঝে মাঝেই ইটের তৈরি সেতু বা viaduct এর ওপর দিয়ে লাইন গেছে যেগুলো সাধারনত প্রায় ৪০০ থেকে ১৫০০ ফিট অবধি লম্বা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে বন্যার জল সহজেই লাইনের নিচ দিয়ে কোনো ক্ষতি না করেই অতিবাহিত হতে পারে। লক্কিসরাই (Luckieserai) থেকে লাইন দুভাগ হয়ে গেছে। লুপ লাইন এগিয়েছে গঙ্গার ধার বরাবর। আর কর্ড লাইন গিয়েছে সোজা কলকাতার দিকে। ট্রেন কর্ড লাইন ধরে মধুপুরের দিকে এগিয়ে চলে। লক্কিসরাই থেকে মধুপুর অবধি বেশ খাড়াই। চারপাশে রুক্ষ, অনুর্বর, পাথুরে জমি, ছোট-বড়ো ভাঙা ভাঙা টিলা অথবা পাথরে ভর্তি। টিলার গায়ে গায়ে বুনো কাঁটাঝোপের আধিক্য। দূর অবধি কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখা যায় না। ট্রেন মধুপুর ছাড়ে দুপুর ২.১৫ মিনিটে। এরপর যত কয়লাখনি অঞ্চলের দিকে এগোতে থাকে চারপাশের অসমান, নির্বান্ধব ভাব কমতে থাকে।

প্রায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ ট্রেন রানীগঞ্জ (Raneegunge) পৌছয়। এটি খনি অঞ্চলের একটি বর্ধিষ্ণু জায়গা। কিন্তু আশেপাশের মাটির কালচে ভাব, ধোয়া ওঠা চিমনিযুক্ত ইঞ্জিনঘর, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বোল্ডার আর তালগাছ দেখে সহজেই Staffordshire ভেবে ভ্রম হবে। সবচেয়ে ভালো কয়লাগুলোকে ট্রেনের ইঞ্জিনে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য রেখে দেওয়া হয়। রানীগঞ্জের পর থেকে লাইন ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে। এবং বর্ধমান পৌছনোর আগেই উর্বর সমতল মাটির দেখা পাওয়া যায়। ৬টার সময় বর্ধমানে (Burdwan) পৌছে ট্রেন এক ঘন্টার ডিনারের বিরতি দেয়। এখানকার খাবারের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এক কথায় বলতে গেলে ভয়ঙ্কর বাজে আর দামী। প্রায় সব খাবারের একই স্বাদ। অল্প খেলেই পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও বাকিটা

খাবার ইচ্ছেই চলে যায়। মটন চপ বা ফাউল কারি বা অন্যান্য মাংসের পদগুলি একবারেই অখাদ্য। ওই মাংস টেনে ছিঁড়তে গেলে, রবার টেনে ছেড়ার কথা মনে পড়তে বাধ্য। ৭টার সময় ট্রেন ফের নড়ে ওঠে। সবুজ ফসলে ঘেরা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে গন্তব্যের দিকে। এইদিকের স্টেশনগুলি আবার বেশ সুন্দর করে ফুলের টব, কেয়ারী, লতানে গাছ দিয়ে সাজানো গোছানো, ছিমছাম। এবং অবশেষে প্রায় ৫৬ ঘন্টার দীর্ঘ যাত্রা শেষ করে ট্রেন পৌছলো হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হাওড়া স্টেশনে। স্টেশনের ঢোকার মুখে অজস্র লাইনের সমাহার দেখে Pennsylvania তে অবস্থিত Philadelphia র কথা মনে হয়।

লেখকের ভাষায়, "হিন্দুস্তানে দীর্ঘ রেলযাত্রা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। সেখানকার মাত্রাতিরিক্ত গরম, মারাত্মক ধুলো আর রেলের খাবারদাবার শরীর-মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো দেশে রেল সম্বন্ধে এত আগ্রহ এবং কদর দেখা যায় না, যতটা এই মহান দেশে দেখা যায়। এই জিনিস কখনো ভোলবার নয়।"

লেখক শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র পেশাগত ভাবে একজন রেল আধিকারিক এবং বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের অতিরিক্ত মহাকর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। তাঁর নানাবিধ শখের মধ্যে অন্যতম হলো রেলের জানা-অজানা নানান ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যসমূহ খুঁজে তা লিপিবদ্ধ করা। এবং মূলতঃ তিনি পূর্ব ভারতীয় রেলের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে এবং জানাতে আগ্রহী। রেল ক্যানভাস পরিবারের তরফ থেকে তাঁর এই অসাধারন কাজে আমাদেরকে শরিক করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমস্ত ইংরেজি বানান তৎকালীন সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার কারণে অপরিবর্তিত।

অনুবাদক - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - সোমতন্ত্র দাস (ছবি সমূহ), অঞ্জন রায় চৌধুরী (প্রচ্ছদ চিত্র)।

ডিজিটাল ভারতের 'মেধা'বী লোকাল

- অনমিত্র বোস

যখন প্রথম তাদের সাথে পরিচয় খবরের কাগজের পাতায় বা সমাজমাধ্যমের ছবি/ভিডিওর মধ্যে দিয়ে। তখন মনে প্রশ্ন জেগেছিল : এগুলি কি সত্যিই EMU লোকাল ট্রেন? অত্যাধুনিক রেকগুলিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অপেক্ষা ছিল কবে কলকাতার বা হাওড়া ডিভিশনে এরকম রেকের দেখা পাওয়া যাবে। আধুনিক হওয়ার পাশাপাশি রেকগুলির গতিবেগও অনেক বেশি মনে হতো ভিডিও তে।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ২০১৮ সালের ২২শে মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রথমবার যাত্রীদের নিয়ে ছুটলো সেই EMU ট্রেন। যাকে দেখলে লোকাল ট্রেনের যে দৃশ্যপট কল্পনায় আসে, সেটির আমূল পরিবর্তন হয় যায়। রেলের পরিভাষায় এই রেকগুলির নাম 3-phase এসি লোকাল। এসি নাম হলেও এটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত নয়। যা প্রথমের দিকে অনেক সাধারণ মানুষই বুঝতে ভুল করতেন। এখানে এসি (AC) বলতে Alternating Current। ওই দিন দক্ষিণ-পূর্ব রেল প্রথমবার হাওড়া-পাঁশকুড়া লোকাল হিসেবে এরকম একটি EMU ট্রেন চালানোর সাথে সাথে সূচনা হয় এক নতুন অধ্যায়ের। সেই বছরেরই বাঙালীর প্রিয় নববর্ষের দিনে, পূর্বরেলও চালু করে এই 3-phase EMU লোকাল, হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের মধ্যে।

এই ধরনের EMU লোকালগুলির ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যাবে, যে সবার প্রথমে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে চালু হয় এই ধরনের ট্রেন। ২০১৩ সালে ভারতে প্রথম, পশ্চিম রেলে 3-phase EMU লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু করা হয়। এই ধরনের রেকগুলির গঠনশৈলী মুম্বইয়ের যাত্রীসংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী মানানসই। মুম্বই আর্বান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (MUTP) এর দ্বিতীয় ফেজ (Phase-II) প্রকল্পের আওতায় এই রেকগুলি তৈরি ও পরিচালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে EMU রেকগুলি লোকাল ট্রেন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কোনোটিই Aerodynamic ছিল না। ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেন বলতে আমরা যা বুঝি, সেটি প্রথম চালু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে, হাওড়া থেকে শেওরাফুলি। ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেন যুগের সাথে সাথে, যাত্রী চাহিদার সাথে সাথে নিজের রূপ বদল করেছে। দক্ষিণ রেলে যেমন দেশের প্রথম ও একমাত্র মিটারগেজ বৈদ্যুতিন EMU পরিষেবা চালু করে, তেমনি মুম্বইয়ের মধ্য রেল শাখায় অনেকদিন অবধি ডিসি (DC – Direct Current) এবং এসি দুই ধরনের EMU ট্রেনই দাপিয়ে বেরিয়েছে। প্রযুক্তিগত ভাবে দেখতে গেলে, এগুলি সবই ছিল ডিসি লোকাল অর্থাৎ, ওভারহেডে বিদ্যুৎ এসি থাকুক বা ডিসি, লোকালগুলির মোটর সব সময়ই ডিসি ট্র্যাকশন মোটর। অর্থাৎ, এসি ওভারহেড বিদ্যুৎ থেকে ডিসিতে পরিবর্তন করে তবেই ডিসি মোটরে সরবরাহ করা হয়। এই পরিবর্তনের পদ্ধতিতে অনেকটা বিদ্যুৎ নষ্ট হয়, সাথে উৎপন্ন হয় মারাত্মক তাপ। এছাড়াও রয়েছে ডিসি মোটরের প্রকৃতিগত কিছু দুর্বলতা।

২০১৩ সাল থেকে সারা দেশের লোকাল ট্রেনের ইতিহাসে হলো এক নতুন যুগের সূচনা – এসে গেলো 3-phase এসি EMU। এই রেকগুলি অত্যাধুনিক হওয়ার সাথে সাথে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটালো multiple unit ট্রেনের বিভাগে। এই

ছবি - অর্কোপল সরকার

ছবিটি লেখকের তোলা

রেকগুলিতে সাধারণত 3-phase ট্র্যাকশন মোটর উপস্থিত থাকে এবং তাকে পরিচালনা করবার জন্য যে চালিকাশক্তি প্রয়োজন হয় তার পুরো পদ্ধতিটাই নতুন। এবং এই চালিকাশক্তি ও চালনার পুরো পদ্ধতিকেই propulsion বলে। প্রথমদিকে শুধু Bombardier Transportation রেকগুলির propulsion উৎপাদন ও সরবরাহ করলেও পরে কেন্দ্রীয় সরকারের Make In India উদ্যোগে হায়দরাবাদের Medha Servo Drives Ltd এইরকম propulsion system উৎপাদন করতে শুরু করে। তাই রেলপ্রেমীরা বম্বারডিয়ার (Bombardier) লোকাল ও মেধা (Medha) লোকাল বলে অভিহিত করে থাকে এদেরকে।

এই রেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর 3-phase AC Synchronous মোটর। যা ডিসি মোটর এর চেয়ে অনেক বেশি কর্মক্ষম, শক্তিশালী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এবং এতে রোটরও অনেক কম ক্ষয় হয়, ফলে রক্ষণাবেক্ষণ অনেক সহজ। কিন্তু আমরা জানি, ওভারহেড তারে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে তা হলো ২৫ কেভি Single Phase এসি। কিন্তু মোটরে দরকার ১৮০০ কেভী 3-phase এসি। এই পরিবর্তন ও বিদ্যুৎকে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য রয়েছে ট্র্যাকশন কনভার্টার (Traction Converter)। ২৫ কিলো ভোল্ট এসি প্রথমে প্যান্টোগ্রাফের সাহায্যে চলে আসে মেইন ট্রান্সফরমারে। ট্রান্সফরমার এর ওপর দিক থেকে Traction winding চলে যায় ট্র্যাকশন কনভার্টারে। ট্র্যাকশন কনভার্টার এর মূল উদ্দেশ্য এই Single phase এসিকে মোটরের উপযোগী 3-phase এসিতে বদলে ফেলা। এর জন্য এই যন্ত্রটির ভিতরে রয়েছে ৩টে মূল অংশ:

ছবি - সোমভদ্র দাস

রেকটিফায়ার (Rectifier), ডিসি ক্যাপাসিটর (Capacitor), ইনভার্টার (Inverter)। রেকটিফায়ার অংশটি Single Phase এসি কে ডিসি ভোল্টেজএ পরিবর্তন করে। রেকটিফায়ারের একক হলো IGBT। এটি একরকমের পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটি খুব অনায়াসেই প্রয়োজনমতো ভোল্টেজ পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, দ্রুত on এবং off করে। এরপরে ডিসি স্টেজে রয়েছে ক্যাপাসিটর ও কিছু সুরক্ষা যন্ত্র। যেগুলি কোনো কারণে শর্ট সার্কিট বা অন্য গোলযোগ এর থেকে হওয়া কোনো প্রভাবকে যন্ত্রটির ক্ষতি করতে দেয়না। ক্যাপাসিটরটির কাজ হলো সবসময় একটি সমান ও মসৃণ ডিসি ভোল্টেজ সরবরাহ করার জন্য। এরপর রয়েছে ইনভার্টার যার উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরাসরি মোটরকে প্রভাবিত করে ও শক্তি জোগায়। এই ইনভার্টারেও রয়েছে IGBT যা নিজের গুণের দ্বারা VVVF 3-phase এসি তৈরি করে। VVVF হলো Variable Volatge Variable Frequency অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে আমরা 3-phase এসি ট্রেকশন মোটর এর গতি ও টর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এ ছাড়াও, এসি ট্রাকশন মোটরের গুণাবলীর প্রধান হলো বিদ্যুত পুনরুৎপাদন। অর্থাৎ যখন ট্রেন স্পীড নেয় যেমন বিদ্যুৎ খরচ হয়, তেমনি ব্রেকিং এর সময় বিদ্যুত উৎপাদন হয়। এই বিদ্যুৎ ট্র্যাকশন কনভার্টার হয়ে আবার ওভেরহেড তারে ফেরত চলে যায়। এর ফলে যত ইউনিট বিদ্যুত ট্রেনটি খরচ করছে তার অনেকাংশই আবার ফিরে আসছে গ্রিডে। ফলে সাশ্রয় অনেকটাই বেড়েছে রেলের। এই পুরো ট্র্যাকশন কনভার্টারের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে Line Converter Control Unit। এটি কনভার্টারটির মস্তিষকের মতো কাজ করে। ট্র্যাকশন বা ব্রেকিং ঠিক কত মাত্রায় হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে এই Control

ছবিটি লেখকের তোলা

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

Unit। মোটর ছাড়াও, রেকের নানা যন্ত্রাংশ ও অনুসারী অংশের নানা রকম ও নানা মাত্রার বিদ্যুৎ দরকার। তার জন্য রয়েছে Auxiliary Converter। এটি মেশিন রুমের ব্লোয়ার, কোচের ব্লোয়ার, কুলিং উনিট এর জন্য যেমন ৪১৫ ভোল্ট এসি উৎপাদন করে, তেমনি লাইট, পাখা, হেডলাইট, স্পিকার ইত্যাদির জন্য ১১০ ভোল্ট ডিসি উৎপাদন করে। এছাড়াও রয়েছে ব্যাটারি চার্জার যার সাহায্যে ব্যাটারি গুলি চার্জ হয়।

যেকোনো multiple unit এর গঠনে মূলত দুই রকমের কোচ থাকে : মোটর কোচ ও ট্রেলার কোচ। প্রথাগত লোকালে দুই প্রান্তে দুটি মোটর কোচ থাকে যা আদতে ড্রাইভার কোচ ও বটে। কিন্তু 3-phase লোকালের গঠন একটু আলাদা। এর দুই প্রান্তে থাকে ড্রাইভিং ট্রেলার কোচ ও তারপরের কোচটি হয় মোটর কোচ। মোটর কোচ এ থাকে মোটর, ট্রান্সফর্মার ও ট্র্যাকশন কনভার্টার। ট্রেলার কোচে রয়েছে Auxiliary Converter ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ। একটি ১২ কোচের লোকালে ৪টি মোটর কোচ থাকে। এই ১২ কোচকে আমরা ৩ কোচের ৪টি ইউনিট হিসেবে দেখতে পারি। দুই প্রান্তের ইউনিট আমরা End Basic Unit (EBU) ও মাঝের ইউনিট দুটিকে Middle Basic Unit (MBU) বলে। একেকটি ইউনিটে থাকে একটি ড্রাইভিং/নন-ড্রাইভিং ট্রেলার কোচ (DTC/NDTC) -- মোটর কোচ (MC) -- একটি হাইব্রিড ভেন্ডার ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ট্রেলার কোচ (NDHC) অথবা সাধারণ নন-ড্রাইভিং ট্রেলার কোচ (NDTC)। তাহলে একটি ১২ কোচের EMU রেকের গঠনশৈলী দাঁড়ালো : DTC-MC-NDHC--NDTC-MC-NDTC--NDTC-MC-NDTC--NDHC-MC-DTC এরকম।

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

পুরো রেকটির মেরুদন্ড হলো Train Control and Management System (TCMS)। এর সাহায্যে মোটর, ব্রেক, ব্লোয়ার থেকে শুরু করে যাত্রীদের জন্য পাখা, আলো সবই নিয়ন্ত্রণ করা যায় ড্রাইভার ক্যাব থেকে, মোটরমানের একটি ক্লিকে। যাত্রীদের জন্য যে তথ্য সময়ের সাথে সাথে পরিবেশন করা হয়, তার পোশাকি নাম Passenger Information System (PIS)। এর মাধ্যমে একটু সময় বাদে বাদে বর্তমান স্টেশন, পরবর্তী স্টেশন, গন্তব্য স্টেশন যাত্রীদের জানানো হয়। এছাড়াও কোচে লাগানো LED বোর্ডে বারবার ভেসে ওঠে এইসব তথ্য ও নানা নিয়মাবলী। এই সবই TCMS এর সঙ্গে সংযুক্ত ও গার্ড/ড্রাইভার কেবিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

গঠনগত বৈশিষ্টর কথায় আসলে এটা প্রথমেই বলা যায় যে, পুরো অন্যরকমের বগি ব্যবহার করা হয়েছে এতে। বগি বলতে কামরা না, বরং চাকা ও এক্সেল নিয়ে যে যন্ত্রাংশ কোচ ও রেললাইনকে সংযুক্ত করে তাকেই কারিগরি ভাষায় বগি বলে। Suspension-এ ব্যবহৃত হয়েছে মূলত : air স্প্রিং যা উৎপন্ন ঝাঁকুনি অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এর ফলে সাধারণ লোকাল ট্রেনের চেয়ে ঝাঁকুনি ও দুলুনি অনেকটাই কম ও যাত্রী অভিজ্ঞতা সুখকর। এছাড়াও কোচগুলি স্টেইনলেস স্টিলের হওয়ায় অনেকটাই হালকা। এর ফলে তরণ (acceleration) ও মন্দন (deceleration) অনেক কম সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও সব গঠনশৈলী অনুকূল হওয়ায় এর সর্বোচ্চ গতিও এক্সপ্রেস ট্রেনের সমান অর্থাৎ ১১০ কিমি প্রতি ঘন্টা ।

অবশেষে ২০১৭ সালে, স্বপ্নপুরণের দিনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের 'মেধা' EMU রেকে প্রথমবার চড়ে সেই স্বপ্নের ঘোরে ডুব দিলাম। যখন হাওড়া ছেড়ে টিকিয়াপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো এই লোকাল, এসি মোটরের মিষ্টি আওয়াজ তখন কানে নিনাদিত হচ্ছে। স্পিকারে মিষ্টি মধুর গলায় ঘোষিকা বলছেন," হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া যাওয়ার এই বারো কোচের ধীর গতির ট্রেনের পরবর্তী স্টেশন টিকিয়াপাড়া"। ব্লোয়ার এর ঠান্ডা হাওয়ায় নিজেকে সিক্ত করে অনুভব করে চলেছি এবং মন নেচে উঠছে যাত্রার আনন্দে। এরপরের বছর আমার নিজের ডিভিশন অর্থাৎ শিয়ালদহ ডিভিশন এ আসলো প্রথম Bombardier রেক। বেশিরভাগ অংশেই দুই রেকই অনুরূপ হলেও মোটরের আওয়াজ, LED বোর্ড এর কিছু পার্থক্য লক্ষণীয় ছিল। পরে জানাতে পারি যে দুটি কোম্পানির TCMS পুরোপুরি আলাদা। ফলত: লোকালগুলির রক্ষনাবেক্ষন ও প্রাথমিক প্রস্তুতি অনেকটাই আলাদা। সেই Bombardier লোকালের যাত্রাও ছিল মনমুগ্ধকর। এরপর থেকে যখনই লোকাল ট্রেনে সফর করি, অপেক্ষা করি যদি সে আসে। মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যখন হলুদ মুখের উপর বড় হরফে ICF লেখা থাকে এবং আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে মনে চাই যেন এরকম সগৌরবে যাত্রীসেবায় ছুটে বেড়াক এই পক্ষীরাজগুলি ও দাপিয়ে বেড়াক শহরতলির নানা প্রান্তে।

প্রচ্ছদ ছবি - সোমভদ্র দাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - অর্কোপল সরকার

রেল ডাকাতির উপাখ্যান

- প্রশান্ত কুমার মিশ্র

১৮৫৫ সালে, লন্ডন ব্রিজ থেকে প্যারিসগামী একটি ট্রেনে, গত শতাব্দীর সব চাইতে রোমহর্ষক রেল ডাকাতির ঘটনাটি ঘটেছিল। যখন মাত্র চারজন লোক আনুমানিক এক মিলিয়ন পাউন্ড মুল্যের সোনা ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। এই অপরাধমূলক ঘটনার দুঃসাহসিকতা এবং আর্থিক মুল্যের প্রেক্ষিতে তার বিশালতা, সে সময় গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছিল। গোটা পৃথিবীর মানুষ এই খবর পেয়ে একধারে যেমন আতঙ্কিত হয়েছিল তেমন রোমাঞ্চও অনুভব করেছিল। এই ঘটনার আকস্মিকতা এতটাই ছিল যে গত শতাব্দির সবচেয়ে স্পর্ধিত অপরাধের তালিকায় তা একদম ওপর দিকে জায়গা করে নেয়। তৎকালীন বিশ্বের দুই প্রবল শক্তিধর, মিত্রশক্তি রাষ্ট্রের কাছে এই ঘটনা এতটাই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে দুই দেশের পুলিশই সেই রেল ডাকাতির ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।

ঘটনাটি ঘটে ১৫ই মে ১৮৫৫ সালের রাতে, যখন সোনার বাঁট ও কয়েন বোঝাই তিনটি বাক্স নিয়ে একটি ট্রেন লন্ডন ব্রিজ থেকে ফোকস্টোন স্টেশনের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। সেখান থেকে জাহাজে করে সেগুলো প্যারিসে পৌছনোর কথা। বাক্সগুলো ছিল গার্ডের কামরায়। ডাকাতরা সংখ্যায় ছিল চারজন। তার মধ্যে দুজন, উইলিয়াম টেস্টার এবং জেমস বারগেস, ছিল ব্রিটেনের দক্ষিণপূর্ব রেলের কর্মচারী। তৃতীয়জন এডওয়ার্ড আগার ছিল পেশাদার অপরাধী আর চতুর্থ ব্যক্তি ছিল ওই রেলেরই পূর্বতন কর্মচারী উইলিয়াম পিয়ার্স যাকে জুয়া খেলার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এই শেষের দুজনই ছিল এই পুরো ডাকাতির মূল চক্রান্তকারী। পুরো ঘটনার পেছনে ছিল এদের দুঃসাহসিক অথচ ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা, সঠিক সঙ্গী নির্বাচন, অভ্যন্তরীণ খবর সরবরাহকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আর সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, অপরাধের আগেই অকুস্থল এবং তার আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করে খুঁটিনাটি তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করা। যেকোনো ভাল রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসে যেরকম সুপরিকল্পিত অপরাধের কথা আমরা পড়ে অভ্যস্ত, বাস্তবের এই ঘটনা তাকেও ছাপিয়ে গেছিল।

তখনকার সময় রেলে করে সোনা নিয়ে যাওয়া হতো বড় বড় মজবুত কাঠের সিন্দুকে করে যার দুটো করে চাবি থাকতো। সঙ্গে গার্ডের কামরায় একজন সশস্ত্র পাহারাওয়ালা গোটা রাস্তা পাহারা দিতো। এই ডাকাতদলটি সবার প্রথমে মোমের ছাঁচের সাহায্যে সিন্দুকের নকল চাবি তৈরি করে। বলা বাহুল্য যে দুই রেল কর্মচারী এইকাজে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করলো। তারপর তারা অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলো সঠিক সময়ের। শীগগিরই খবর পেলো যে সোনা কবে যাবে এবং কত যাবে। নির্দিষ্ট দিনেই যাতে বার্গেসের ডিউটি ওই ট্রেনেই পাহারা দেবার জন্য পরে এটা নিশ্চিত করতে সাহায্য করলো টেস্টার। তারা ঘটনার দিন যাত্রার আগেই কুখ্যাত এডওয়ার্ড আগারকে গার্ডের কামরায় লুকিয়ে তুলে দেয়। তারপর যাত্রা আরম্ভ হবার পর তিনজনে সিন্দুক খুলে ১০২ কিলো ওজনের সোনার বাঁট ও সোনার কয়েন লুঠ করে যার তখনকার আনুমানিক মুল্য ছিল বারো হাজার পাউন্ড (অর্থাৎ এখনকার হিসেবে যা প্রায় ১,১৫০,০০০ পাউন্ড)। এরপর পুর্বপরিকল্পনা মত পাহারাওয়ালা বার্গেস ট্রেনেই থেকে যায় যাতে কারুর সন্দেহ না হয় আর বাকিরা পথেই ডোভার স্টেশনে নেবে যায় যেখানে পিয়ারস ওদের জন্য অপেক্ষায়ে ছিল। এই কারণে প্রথমে কেউ ধরতেই পারে নি যে লুঠের ঘটনা আদৌ ট্রেনে ঘটেছে নাকি জাহাজে।

এই রহস্য হয়েতো আজীবন অমীমাংসিতই থেকে যেত যদি না এডওয়ার্ড আগারের প্রাক্তন প্রেমিকা নিজেকে প্রতারিত মনে করতো। অন্য একটা মামলায় আগারের যখন কিছুদিনের কারাবাস হয় তখন সে উইলিয়াম পিয়ার্সকে তার প্রেমিকা ও ছেলেকে কিছু অর্থসাহায্য করতে বলে। পিয়ার্স প্রথমে রাজি হয়েও পরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তখন সেই মহিলা পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে দেয় পিয়ার্সকে ফাঁসানোর জন্য। আগার এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে যায় এবং পুরো দলটাই ধরা পরে।

১৯৭৫ সালে জুরাসিক পার্ক খ্যাত লেখক মাইকেল ক্রিকটন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'The Great Train Robbery' বলে একটি নভেল লেখেন এবং একই নামে একটি ফিল্মও প্রযোজনা করেন।

এই ঘটনার মাত্র নবছর পরে ১৮৬৪ সালে, ভারতেও এরকমই এক দুর্ধর্ষ রেল ডাকাতির কথা প্রকাশ্যে আসে। এক মঙ্গলবার রাত্তিরে, বেঙ্গল ব্যাংক থেকে নগদ তিন লক্ষ্য টাকা ট্রেনে করে হাওড়া থেকে পাটনা পাঠানো হচ্ছিল। ডাকের সুরক্ষিত কামরায় সাতটি বাক্সে ভরে টাকাগুলি রাখা ছিল। এই টাকা পাহারা দেবার জন্য কলকাতা পুলিশের দুজন সশস্ত্র সার্জেন্টকে সঙ্গে পাঠানো হয়। তারা ডাকের কামরার লাগোয়া একটা কমপার্টমেন্টে যাত্রা করছিলেন।

ওই একই ট্রেনে, চার্লস ফরেস্ট নামে এক ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলের পূর্বতন কর্মী, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সফর করছিল। যথাসময় ট্রেন হাওড়া ছাড়ে এবং নির্ধারিত সূচি মেনে গভীর রাতে সাঁইথিয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে মিনিট কুড়ির বিরতির ফাঁকে ফরেস্ট নাকি কোনো এক আশ্চর্য উপায়, সুরক্ষিত ডাকের কামরায় অনধিকার প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এরপরে গাড়ি ছাড়ার অল্প কিছু পরেই সাতটি টাকার বাক্স সে সাঁইথিয়া ও তার পরবর্তী স্টেশন মল্লারপুরের মাঝে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। ট্রেন তখন প্রায় ৪০ কিমি গতিতে ছুটছিল। মল্লারপুরে ট্রেন থামলে সে নেমে আসে। টিকিট না থাকার দরুন সে জরিমানা দিয়ে টিকিট কাটে এবং যত দ্রুত সম্ভব রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকে। এক এক করে সে সাতটি বাক্সই উদ্ধার করে। এবং সমস্তগুলোকে এক জায়গায় জড় করে তার নিজস্য রেলের ছাপ মারা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়।

একটু বিশ্রাম নিয়ে সে নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করার চেষ্টা করে। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গ্রামবাসীদের ফরেস্টের রকমসকম দেখে সন্দেহ হয়। এইরকম ভোররাত্তিরে একজন সাদা চামড়ার লোক এসে বেশি টাকা ভাড়া দিয়ে গরুর গাড়িতে মাল নিয়ে যেতে চাইছে দেখে তাদের মনে ধন্দ লাগে। কিছু লোক তখন ফরেস্টের সাথে সাথে রেল লাইনের ধার পর্যন্ত চলে আসে। তখন উপায়ন্তর না দেখে ফরেস্ট তাদেরকে আরো বেশি টাকা ভাড়া দেবার লোভ দেখায়। কিন্তু এতে উল্টে গ্রামবাসীদের সন্দেহ আরো বাড়ে। তারা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে যে তাদের মধ্যে দুজন মল্লারপুর স্টেশনে গিয়ে স্টেশনমাষ্টার কে জানাবে যে ট্রেন থেকে কিছু সরকারি মাল পরে গেছে এবং এক সাহেব সেটা চুরি করার মতলব করছে। বাকিরা ঘটনাস্থলে থেকে ফরেস্টের ওপর নজরদারী করবে যাতে সে পালাতে না পারে।

ভোরবেলা মল্লারপুরের স্টেশনমাষ্টার সবে কাজে বসেছেন এমন সময় দুইজন গ্রামবাসী তাঁকে ঘটনার কথা বিশদে জানায়। এই খবর পেয়ে তিনি হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে রেল পুলিশের ইনস্পেক্টর মিঃ গ্রেডনকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। এরপর তারা দুজনেই

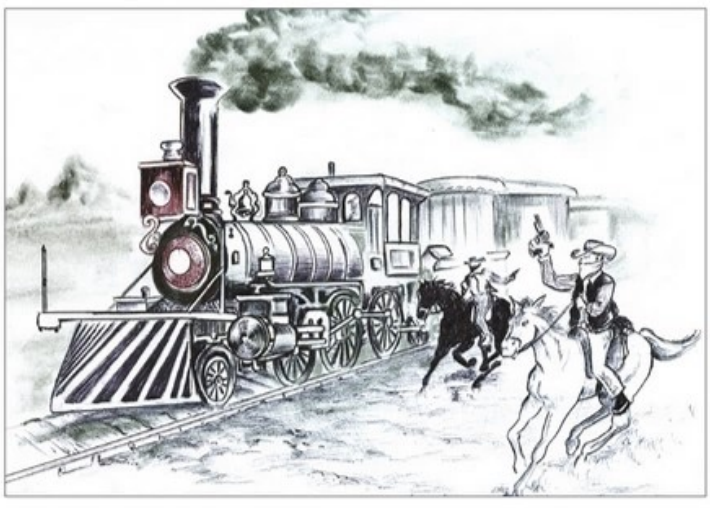

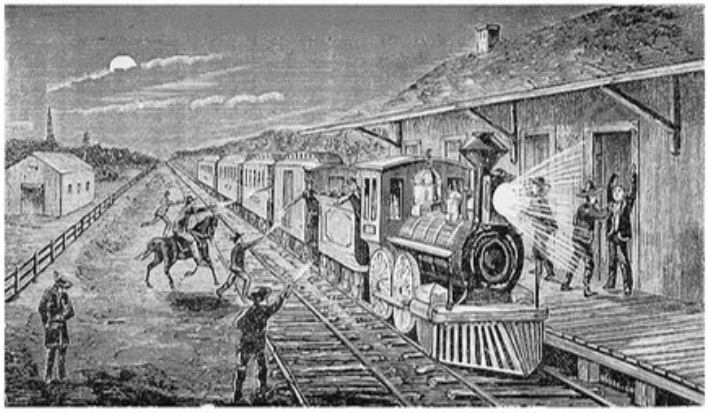

অকুস্থলে যাবার জন্য বেরিয়ে পরেন। ওখানে পৌছে তারা দেখেন যে চার্লস ফরেস্ট টাকার বাক্সগুলো সমেত ওখানে বসে আছেন এবং গ্রামবাসীরা তাকে ঘিরে রেখেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় এবং বাক্সগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আটক হওয়ার আগে চার্লস ফরেস্ট তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে। এর ফাঁকে দেখা যায় কোন কোন গ্রামবাসী এরমধ্যে কিছু টাকা নিজেদের মধ্যেই হাতসাফাই করে নিয়েছে। কারণ ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে আরো একটা অর্ধেক টাকা ভর্তি ব্যাগ পাওয়া যায়। বাকি টাকা অবশ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

এরই মধ্যে মজার ব্যাপার হলো এই যে ট্রেনে পাহারারত দুই সার্জেন্ট গোটা ঘটনা সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহল ছিলেন না। তারা ব্যাপারটা ধরতে পারেন রুটিন চেক করার সময়, যখন ট্রেন সাঁইথিয়ার আরও ছটা স্টেশন পরে গিয়ে থামে।

চার্লস ফরেস্টকে বীরভূম আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টগউডের সামনে পেশ করা হলে সেখানে নিজের আত্মপক্ষ্য সমর্থনে সে জানায় যে সাঁইথিয়ায় কিছু জিনিস ভুলে ফেলে আসার দরুন সে হেঁটে ফেরত যাচ্ছিল এমন সময় লাইনের ধারে এই বাক্সগুলো তার নজরে পড়ে। দেখেই সে বুঝতে পারে যে ওগুলো সরকারী সম্পত্তি। তাই সেগুলো যথাস্থানে ফেরত দেবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার আশঙ্কা ছিল যে স্থানীয় গ্রামবাসীরা দেখতে পেলে সব নির্ঘাত লুঠ হয়ে যাবে। সে এও জানায় যে বেশি ভাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কেউ তাকে সাহায্য করেনি। তারপর সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয় যখন পুলিশ গিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা বা বাহবা দেবার বদলে উল্টে আটক করে, এবং চোর সাজিয়ে গ্রেপ্তার করে বসে। পুলিশের এই আচরণ তাকে ব্যথিত করেছে।

সরকার পক্ষের উকিল দাবী করেন যে অভিযুক্তকে ঘটনাস্থল থেকে বামাল সমেত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাঁদি পক্ষের উকিল দাবী করেন যে সাঁইথিয়া থেকে ট্রেন ছাড়ার মিনিট কুড়ির মধ্যে বাক্স ফেলা হয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে কারুর পক্ষে ৪০ কিমি গতিতে চলন্ত ট্রেনের সুরক্ষিত ডাক কামরায় ভেঙে ঢুকে সাতখানা বাক্স ফেলা কোনমতেই সম্ভব নয়।

তিনজন জুরিদের মধ্যে দুজন, ডাকাতির ঘটনায় চার্লস ফরেস্টকে উপযুক্ত প্রমানের অভাবে রেহাই দেয় কিন্তু চোরাই মাল নিজের কাছে রাখার অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। এর ফলে তার তিন বছরের কারাদন্ড হয়।

কি করে কোন উপায়ে যে চার্লস ফরেস্ট সেই সুরক্ষিত কামরায় ঢুকতে পেরেছিল তা আজও জানা যায়নি। কারণ সে এইনিয়ে কখনো মুখ খোলেনি। এবিষয় শুধু একটুকুই অনুমান করা যায় যে যেহেতু চার্লস ফরেস্ট নিজেও আগে রেলে কাজ করতো তাই তারপক্ষে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং তার কোন বন্ধু বা পূর্বতন সহকর্মীর থেকে এই ব্যাপারে সাহায্য পেয়ে এই কাজ সে করে থাকবে।

উপরোক্ত দুটি রেল ডাকাতির ঘটনাতেই দুটি একই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। দুটোই

অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও সুপরিকল্পিত রেল ডাকাতি। এবং দুই ক্ষেত্রেই জড়িতদের মধ্যে অন্তত একজন পূর্বতন রেলকর্মী ছিল, যাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। উইলিয়াম পিয়ার্স বরখাস্ত হয় জুয়া খেলার অপরাধে। চার্লস ফরেস্টের চাকরি যায় কর্মস্থলে বিধিবহির্ভূত কাজ করার ফলস্বরূপ।

এই ঘটনার পর থেকে শিক্ষা নিয়ে সশস্ত্র পাহারাওয়ালাদের টাকা বা সোনার সাথে একই কামরায় যাত্রা করার নিয়ম চালু করা হয়। এর সাথে সিন্দুকগুলোর জন্য নতুন ধরনের তালার ব্যবহারও শুরু হয়।

দুটি ঘটনার পরেই খবরের কাগজে হইচই বাধে। কিন্তু এডওয়ার্ড আগারের নাম যতটা বহুল প্রচারিত হয়েছিল চার্লস ফরেস্টকে নিয়ে সেই তুলনায় মাতামাতি হয়নি বললেই চলে। কিন্তু দুজনের কাজই কিন্তু গোটা দুনিয়া কে কাঁপিয়ে দিয়েছিল কারণ শুধু টাকার হিসেবে ঘটনাগুলো বিরাট তো ছিলই কিন্তু দুঃসাহসিকতা আর অধ্যাবসায়ের নিরিখে দুজন মূল অপরাধীই ছিল অসাধারন। আগারের সম্বন্ধে তাই লেখা হয়েছিল যে সে যদি তার অসাধারন বুদ্ধি ও প্রতিভার কণামাত্রও কোন ভাল কাজে লাগাতো তাহলে তার জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারতো।

লেখক শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র পেশাগত ভাবে একজন রেল আধিকারিক এবং বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের অতিরিক্ত মহাকর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। তাঁর নানাবিধ শখের মধ্যে অন্যতম হলো রেলের জানা-অজানা নানান ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যসমূহ খুঁজে তা লিপিবদ্ধ করা। এবং মূলতঃ তিনি পূর্ব ভারতীয় রেলের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে এবং জানাতে আগ্রহী। রেল ক্যানভাস পরিবারের তরফ থেকে তাঁর এই অসাধারন কাজে আমাদেরকে শরিক করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুবাদক - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী। *ব্যবহৃতছবিগুলি প্রতীকী এবং ইন্টারনেট থেকে গৃহীত।*

ট্রাম বাঁচান

CTUA
Calcutta Tram Users Association

ট্রাম একটি
পরিবেশ বান্ধব
যান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ট্রামের পুনরুজ্জীবনের দাবীতে সোচ্চার হতে সকল নাগরিকদের আবেদন জানানো হচ্ছে

জল ছবি

জল ছবি

স্মৃতির সরণী বেয়ে...

বিশাখাপত্তম শেডের জোড়া WDG3A লোকো একটি লৌহ আকরিক বোঝাই BOXN রেকের সাথে অপেক্ষারত। পাশে একটি রায়পুর এর WDG3A তার পরবর্তী কাজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

- সোমশুভ্র দাস

মহাপ্রভুর চিত্রখচিত ও অনন্যসাধারণ একটি বন্ডামুন্ডা শেডের WDM3A লোকো একটি এক্সপ্রেস ট্রেনকে সগৌরবে বহন করে চলেছে।

- সোমশুভ্র দাস

ডিজেল শাখায় দ্রুত ও নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করার জন্য ডেমু সুপরিচিত। দুই যুগের রেকের কামরার মিশেলে গঠিত এক সুন্দর ডেমু রেক তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ধাবমান।

- রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

বর্ধমান শেডের এক প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য WDM2 লোকো একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়ে ভেদিয়া স্টেশনে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে।

- অঞ্জন রায় চৌধুরী

ভারতীয় রেলের এক যুগান্তকারী ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন -- WAM4। টাটানগর শেডের WAM4 হাওড়া - রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকে নিয়ে রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা।

- অর্কোপল সরকার

কৃষ্ণরাজাপুরম শেডের WDM3A ইঞ্জিন ব্যাঙ্গালোর সিটির দিক থেকে নিজগৃহের পথে।

- রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

তিরুচিরাপল্লীর কিংবদন্তি শেড গোল্ডেন রক এর একটি WDM2 লোকো তার পরবর্তী দায়িত্বর জন্য অপেক্ষারত।

- রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সুদূর দক্ষিণ ভারতের আরাককোনাম শেডের WAG5 একটি মেঘলা দিনে কয়লা বোঝাই রেক বজবজের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে।

- অনমিত্র বোস

জল ছবি

স্মৃতির সরণী বেয়ে...

সাহেবগঞ্জ লুপ বলতেই চোখে ভেসে ওঠে লাল মাটির দেশ ও ডিজেল ইঞ্জিনের সুমধুর শব্দ। একটি যাত্রীবাহী ট্রেন নিয়ে একটি ALCo ইঞ্জিন গতি নিচ্ছে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

- সোমশুভ্র দাস

হাওড়া শেডের ডিজেল ইঞ্জিনগুলি তখন ছিল সত্যি সমাদৃত। নলহাটিতে গণদেবতা এক্সপ্রেসের প্রবেশ করার মুহূর্তে।

- সোমশুভ্র দাস

সোনারপুর কারশেডের একটি ইএমউ রেক শিয়ালদহ শাখার নিজস্ব আবরণে সজ্জিত হয়ে লেক গার্ডেন্স হয়ে বজবজের উদ্যেশ্যে ধাবমান।

- অর্কোপল সরকার

অন্ধ্রপ্রদেশের এক অপিরিচিত শাখায় ছুটে চলে এই মজার রেলবাস-- কাকিনাড়া টাউন থেকে কটিপল্লি।

- শুভদ্যুতি বোস

জল ছবি

স্মৃতির সরণী বেয়ে...

দক্ষিণ মধ্য রেলের কাটনি শেডের ইঞ্জিন একটি বিসিএন রেক নিয়ে নলহাটি প্রবেশ করছে।

- সোমশুভ্র দাস

ন্যারোগেজের অন্যতম ব্যস্ত জংশন ছিল নায়নপুর। দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলের এই স্টেশনে ছিল অগুনতি মানুষ ও অসংখ্য ট্রেনের আনাগোনা।

- শুভদ্যুতি বোস

খড়গপুর শেডের একজোড়া WDG3A পূর্ব-তট রেলের (ECoR) রায়গড়া স্টেশনে একটি মালগাড়ির সাথে প্রবেশ করছে।

- শুভদ্যুতি বোস

বর্ধমান শেডের একটি সুদর্শন WDM3A লোকো যাত্রীবাহী ট্রেনের সাথে নিজের গতিতে নিজ গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে।

- অঞ্জন রায় চৌধুরী

জল ছবি

স্মৃতির সরণী বেয়ে...

পূর্ব তট রেল ও পণ্যপরিবহন একে অন্যের পরিপূরক। ভাইজাগ ডিজেল শেডের দুটি অনিন্দ্যসুন্দর Baldie WDG3A সম্বলপুরে একটি মালগাড়ির সাথে দাঁড়িয়ে।

- সোমশুভ্র দাস

কাজিপেট শেডের একটি WDM2A, ধ্রুপদী রূপে একটি রেককে সান্ট করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

- রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

স্মৃতির স্মরণী থেকে সাহেবগঞ্জ লুপের ডিজেল যুগ, বর্ধমান গামী রামপুরহাট বর্ধমান বামদেব প্যাসেঞ্জার খানা জংশনে প্রবেশ করার মুহূর্তে।

- অর্কোপল সরকার

WAG5 লোকোটি পণ্যপরিবহনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। আসানসোল শেডের ইঞ্জিন একটি কন্টেনার রেক নিয়ে কলকাতা পোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে।

- অনমিত্র বোস

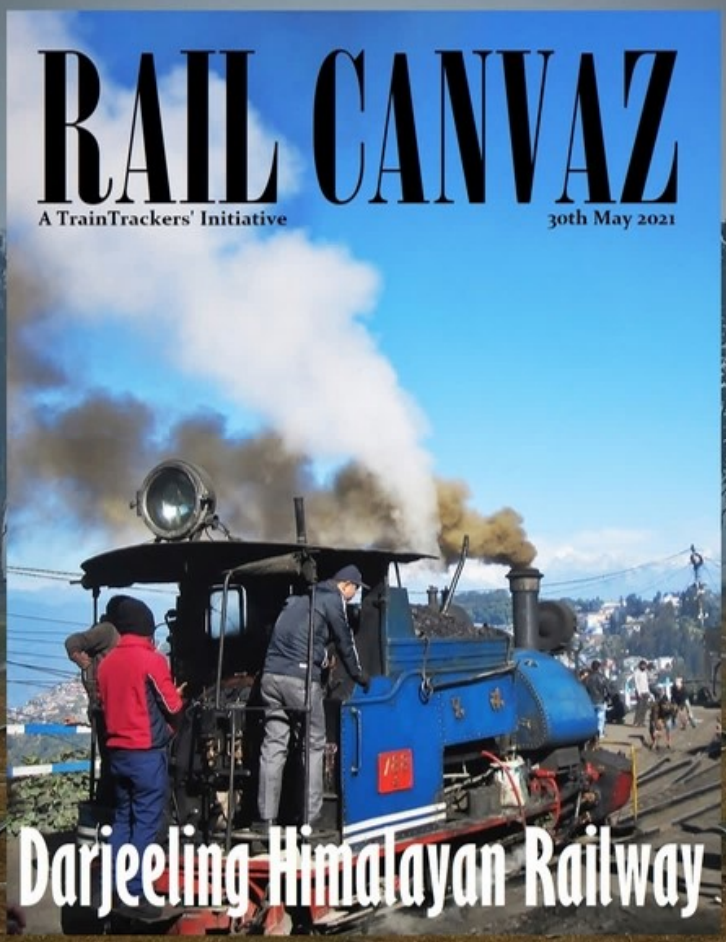

প্রকাশিত হতে চলেছে আগামী ৩০শে মে ২০২১
টুং, সোনাদা, ঘুম পেড়িয়ে
আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে
যখন তখন পৌছে যেতে - তৈরি থাকুন
দুষ্টু দোদো সিরিংএর দেশে পাড়ি দিতে॥